পরশমণি

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী
১১০, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪

প্রকাশক :

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী

১১০, বিধান সরণি

কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর :

শ্রীপাঁচুগোপাল সাধুখাঁ

৫, মধুসূদন চ্যাটার্জ্জি লেন,

কলিকাতা-২

প্রচ্ছদপট :

শ্রীগণেশ বসু

যিনি আমার জীবনে পরম গুরু

আমার পথ প্রদর্শিকা

সেই মহিমাময়ী মায়ের

পুণ্য-স্মৃতিতে

আমার উপন্যাস

"পরশমণি"

উৎসর্গ করছি

গোবরডাঙ্গা
২৪-পরগণা
২-৫-৬৫

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

"পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট লেখিকার নিবেদন—

ইদানীংকালে বাজারে আমার নাম নকল করিয়া বহু উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে জানাইতেছেন। পাঠক-পাঠিকা, প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষকগণের অবগতির জন্য তাঁহাদের অনুরোধে আমি জানাইতেছি, আমার লিখিত উপন্যাস ও অন্যান্য রচনাদিতে আমার নাম সহি করা থাকিবে। যাহাতে তাঁহারা সতর্ক হইতে পারিবেন।

শ্রী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী।

লেখিকার অন্যান্য বই—

- সান্ধ্যদীপ
- স্বামী-স্ত্রী
- লক্ষ্মীবরণ
- সোনার সংসার
- মরু নির্ঝর
- সন্ধ্যার মেঘমালা
- ফোটা ফুল
- ঘরের আলো
- আশাপথে

বেলা তখন অনেক হইয়া গিয়াছে, সুরমার পূজা তখনও সমাপ্ত হয় নাই। দাসী ভেজান দরজার এতটুকু ফাঁক দিয়া ভিতরের দিকে উঁকি দিল।

পূজার মুহূর্ত্তে ডাকিয়া বাধা দেওয়া মোটেই উপযুক্ত নয়, অথচ উপায়ও নাই। কর্ত্তার আদেশ অমান্য করিবার যো নাই, গৃহিণীর বিরাগ ভাজন হইলেও কর্ত্তার আদেশ পালন করিতেই হইবে।

কৌশলে কাজ সারিবার জন্য একবার সে দরজাটা জোরে নাড়া দিল, একবার কাশিল—সুরমা নিস্পন্দ হইয়াই রহিলেন। সাহসে ভর করিয়া দাসী ডাকিল—"মা" সুরমা একটু নড়িলেন মাত্র। দাসী আবার ডাকিল—"মা—" সুরমা চক্ষু মেলিলেন।

দাসী বলিল, "কর্ত্তাবাবু ভিতরে এসেছেন, খুব দরকার বলে আপনাকে এখনই একবার যেতে বললেন।"

সুরমা হাতের ফুলটি নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "যাচ্ছি বল গিয়ে—"

দাসী চলিয়া গেল।

পূজা যেন অসমাপ্ত রহিয়া গেল—সুরমার মন আজ খুসি হইতে পারিল না। সুরমা প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রজের মঙ্গল করো ঠাকুর, সে যেখানেই থাকুক যেন ভালো থাকে—সুখে থাকে।

সে এবার বাড়ী আসিবে বলিয়াছে, নিশ্চয়ই আসিবে।

কতকাল সে বাড়ী আসে নাই—মা হিসাব করিয়া দেখিলেন, আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

সে তখন ছিল চৌদ্দ বৎসরের ছেলে, বাধ্য ছেলে, মা ছাড়া জগতে তাহার যেন কিছুই ছিল না।

পিতা অবনীনাথ রায় পুত্রকে ঠিক নিজের বংশের ধারায় গড়ি তুলিতে চাহিয়াছিলেন। রায়বংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তম আছে, এ বংশের প্রত্যেকেই অতি তেজস্বী, সাহসী ও শক্তিশা নামে আবহমানকাল দেশে পরিচিত। নারীজনোচিত কোমল তাঁহারা প্রাণপণে বর্জ্জন করিয়া চলেন, দু' ফোঁটা চোখের ফেলিলেই তাঁহাদের মন গলিত না। চিরকাল এ বংশ এমনই দর্পে সহিত প্রজা শাসন করিয়া আসিতেছেন, ইহারা কাহারও কথা কানে নেন্ না।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর মিলনের মাঝে প্রকাণ্ড বড় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছিল এই বংশমর্য্যাদা। এত বড় ব্যবধান দূর করিবার ক্ষমতা সুরমার ছিল না, অনর্থক হইবে জানিয়া সে চেষ্টাও তিনি করেন নাই।

সুরমা নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রামজয় তর্কলঙ্কারের কন্যা। তর্কালঙ্কার মহাশয় ছিলেন আদর্শ ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। সুরমা পিতৃবংশের ধারা পাইয়াছিলেন, জীবের দুঃখকষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না; কাহারও দুঃখকষ্ট দেখিয়া তিনি নিজেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন। সম্পূর্ণ বিপরীত শাক্তবংশে তাঁহার বিবাহ হওয়া দৈবের বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। দাম্ভিক স্বামীর ক্ষমতার গর্ব্ব সুরমার অন্তর গুঁড়াইয়া চুরমার করিয়া দিয়াছিল।

পুত্র পিতাকে অনুকরণ করে নাই, মাকে সে অনুকরণ করিয়াছিল, মায়ের ছায়া তাই সম্পূর্ণ পড়িয়াছিল পুত্রের উপরে। মায়ের ধারায় পুত্রকে অনুপ্রাণিত হইতে দেখিয়া পিতা অবনীনাথ রায় রোষে ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রজাদের পীড়ন করিয়া বশ করিতে চাহিতেন, পুত্র সেই নির্য্যাতীতদের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশাইত, ফলে পিতার শাসন হইয়া যাইত ব্যর্থ।

অনেক করিয়া বুঝাইয়া, তাড়না করিয়া, শাসনের ভয় দেখাইয়া তাহাকে বশ করিতে না পারিয়া অবশেষে পিতা তাহাকে দূর পাঞ্জাবে তাঁহার এক বন্ধুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

পুত্রকে বাধ্য করিবার এই নূতন পদ্ধতি দেখিয়া সুরমা স্তব্ধ হইয়া

ছিলেন। স্বামী একবারও তাঁহার মত জানিতে চান নাই, একেবারে সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরকে তিনি পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দিতেছেন, যেহেতু বাংলায় থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা ছাড়া সাহচর্য্যও এখানে ভালো নয়।

সাহচর্য্য যে ভালো নয় তাহা সুরমাও বুঝিয়াছিলেন। বাহিরের সাহচর্য্যের প্রভাব ব্রজেশ্বরের উপর বিস্তৃত হইতে পারে নাই; তাঁহার সাহচর্য্যই ব্রজেশ্বরকে নষ্ট করিয়া দিতেছে—কেবল মাত্র পিতার নয়—পিতৃবংশের সকলের ধারণাই এই।

সুরমা একটী কথাও বলেন নাই—নিস্তব্ধে কেবল পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া ছিলেন।

বিদেশে যাওয়ার আনন্দে ব্রজেশ্বরের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল মাকে সে প্রবোধ দিবার জন্যই বলিয়াছিল, "আমি আবার আসব মা, তুমি আমার জন্যে একটুও ভেব না।"

এ সান্ত্বনায় মায়ের মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গিয়াছিল।

তিনি জানিতেন ব্রজেশ্বরকে ঠিক এই কথা বলিয়াই বুঝান হইয়াছে, সে জানে বৎসরে দুইবার লম্বা ছুটি পাইয়া যেমন সকল ছেলেই বাড়ী যাইতে পায়, সেও তেমনই বাড়ী আসিবে।

তাহার এই বিশ্বাসই থাক, মা তাহার এ বিশ্বাস ভাঙেন নাই, পিতার উপর যাহাতে তাহার শ্রদ্ধা ভালবাসা ক্ষুণ্ন হয়, তাহা তিনি করিতে চাহেন নাই।

দীর্ঘ আট বৎসর অতীত হইয়া গেছে, মা তাঁহার একমাত্র পুত্রের মুখ আট বৎসর দেখেন নাই।

অবনী রায় বৎসরে দুইবার করিয়া পাঞ্জাবে যান, পুত্রকে দেখিয়া আসেন। প্রতি সপ্তাহে পুত্রের নিকট হইতে একখানি করিয়া পত্র পান—মায়ের সেইটুকুই সান্ত্বনা।

অবনী রায় পাঞ্জাব হইতে ফিরিলেও তিনি পুত্রের কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নাই, কোনদিন জানিতে চাহেন নাই সে কবে আসিবে।

অবনী রায়ও কোন দিন কোন কথা বলেন না—স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে এড়াইয়া যান-—জিজ্ঞাসা না করিলে কোন কথার উত্তর দেওয়া সমীচিন মনে করেন না।

শাক্ত ও বৈষ্ণব ঠিক ততখানিই দূরে রহিয়া গেছে কেহ কাহারও নাগাল পায় না।

আজ প্রথম সুরমার জীবনে স্বামীর আহ্বান আসিয়াছে—

অজ্ঞাত আশঙ্কায় অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—ব্রজের কোন অসুখ হয় নাই তো?

কয়েকটা দিন আগে ব্রজেশ্বরের পত্র আসিয়াছে সে শীঘ্রই আসিবে তাহার ওখানকার পড়া সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে তাহার কি অসুখ হইয়াছে—নচেৎ স্বামী আজ স্ত্রীকে ডাকিলেন কেন?

সুরমা গলায় কাপড় জড়াইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন—

সুসংবাদই যেন আসিয়া থাকে ঠাকুর। তুঃখিনীর জীবনে আর কোন সুখ নাই, সান্ত্বনা নাই, ব্যর্থ জীবনের সার্থকতা ওই ছেলেটি। জগতে তিনি একা—সম্পূর্ণ একা—ব্রজ ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই।

চোখের জলে মাটি ভিজিয়া উঠিল, বাহির হইতে দাসী আবার ডাকিল "মা—"

"যাচ্ছি"—বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিয়া সুরমা দাঁড়াইলেন।

*

*   *

অবনী রায় বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। হাতে ছিল একখানা পত্র, সেখানা তিনি বারবার নাড়াচাড়া করিতেছিলেন।

সুরমা তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া সে মুখ বেশ প্রফুল্ল দেখিতে পাইলেন।

অবনী রায় চোখ তুলিয়া পত্নীর পানে তাকাইলেন, বলিলেন, "একটা বিশেষ দরকারে আমায় এখনই ভেতরে আসতে হয়েছে। ব্রজের পত্র এখনি এলো কিনা—"

সুরমা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি লিখেছে ?"

অবনী রায় বলিলেন, "সে আজ বাড়ী আসছে দুপুরেই এসে পৌঁছাবে।"

"আজই দুপুরে—এই তো দুপুর—"

আনন্দে মাতৃবক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কতকক্ষণ তিনি কথা বলিতে পারিলেন না।

তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আজই আসবে লিখেছে ?"

অবনী রায় উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ—"মুহূর্ত্ত মাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমার একটা কথা আছে সুরমা। সেই জন্য পত্র পাওয়ামাত্র আমি সব কাজ ফেলে তোমার কাছে এসেছি।"—

কথাটা যে কি তাহা সুরমা অনুভবে বুঝিয়া লইলেন তিনি স্বামীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

অবনী রায় সম্মুখে প্রসারিত আকাশের পানে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া ছিলেন। যেন তিনি কি বলিতে আসিয়াছেন—সেই কথাটা কিভাবে আরম্ভ করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন।

"হ্যাঁ, কি বলতে এসেছি শোন সুরমা। আমাদের একটী মাত্র ছেলে আজ দীর্ঘ আট বছর পরে আমাদের কাছে ফিরে আসছে, এ আনন্দ আমাদের দুজনেরই সমান। কতখানি ব্যথা সয়ে আমায় আমাদের একটীমাত্র সন্তানকে দূরে রাখতে হয়েছে তা তো জানোই তুমি। আমি নিজে বছরে দু'বার করে তাকে দেখতে গেছি, কিন্তু তুমি তো এই আট বছর তাকে দেখতে পাওনি, কেন মাতৃবক্ষ হতে সন্তানকে এত তফাতে রেখেছি তা কি জানো সুরমা ?"

সুরমা মুখ তুলিলেন—"জানি—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর দৃঢ়, চক্ষু দুইটি দৃপ্ত।

অবনী রায় বলিলেন, "জানো তা জানি, তবু আজ আমার নিজের মুখ হতেই শোন সুরমা, কোনদিন নিজে তোমায় এ সব কথা বলিনি। যার ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে তাকে তোমার কাছ হতে অনেক দূরে রেখেছি সে আজ আসছে, সেই জন্যেই সে কথাটা তোমায় বলা দরকার বলে মনে করি। আমি তার এতটুকু বেলা হতে লক্ষ্য করেছিলুম—মাতুল বংশের প্রভাব তার চরিত্রে ফুটে উঠতে ; কিন্তু আমি তা সইতে পারিনি সুরমা, সেই জন্যেই তোমার কাছ হতে তাকে তফাতে—পাঠিয়েছি।"

সুরমা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, বলিলেন, "তাও জানি।"

অবনী রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, জানো সবই, কেবল জানো না সে তোমার পিতৃবংশের পদ্ধতি ত্যাগ করেছে, সে ফিরেছে, আমার বংশের ধারা সে গ্রহণ করেছে। আমার বংশের অপমান আমি সইতে পারিনে সুরমা, আমার রক্ত তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, রক্তে আগুন লেগেছিল। আজ সে আগের কথা ভুলে গেছে সুরমা। সে আমার বংশের নাম রাখতে পারবে, তাকে দেখে তার পরিচয় পেয়ে এ আশা আমি করতে পারি। তোমায় তবু আজ বলতে এসেছি, আমার বংশের প্রভাব মিথ্যে হয়ে যাবে মায়ের শক্তির কাছে, আমার সেইটাই বড় ভয়, বড় ভাবনা। তোমায় আমি অনুনয় করে বলছি সুরমা, আমার ছেলেকে আমায় দিয়ো, আমার বংশের নামে ওকে পরিচিত হতে দিয়ো, তোমার মোহজালে তাকে আর ঘিরো না।"

"আমার মোহজাল—"

সুরমা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

অবনী রায় উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তোমার মোহজাল, মায়ের অনন্ত ভালোবাসা, যে ভালোবাসার কাছে সন্তানের চোখে স্বর্গও তুচ্ছ হয়ে যায়। বাপ তখন থাকে অনেক দূরে। মা সন্তানের মাঝে যাওয়ার অধিকার বাপের থাকে না। সুরমা, সে প্রমাণ আমি পেয়েছি,—আমার ছেলে আমার আদেশ মেনেছে তোমার আদেশের জন্যে,—তোমার গুরু বলে আমার কথা সে রেখেছে। আমার বংশের ছেলে—যার শক্তি হবে অসীম, সাহস হবে দুর্বার, সে হয়ে উঠেছিল অতি কোমল প্রকৃতিতে সে হয়ে উঠেছিল একটী মেয়ের মত। সাহস তার ছিল না, মায়ের আঁচলের তলায় সে ঢাকা থাকতে চাইত, কারও এতটুকু কষ্টের কথা শুনলে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। কিন্তু সুরমা, আমার বংশের ছেলে তো বেদনায় গলবে না—কান্নায় ভিজবে না,—আমি অমন ছেলে তো পেতে চাইনি, আমি চাই সেই রকম ছেলে যার বুক হবে বজ্রের মত শক্ত, যেখানে এতটুকু রেখাও বসবে না। তাকে তোমরা অত্যাচারী বল, শয়তান বল, তবু তাই চাই, আমার বংশ রক্ষা করতে সেই ছেলেরই দরকার।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আট বছরের ব্যবধান তাকে মানুষ করেছে, আজ সে ঠিক আমার আদর্শ নিয়েছে, সেই পথে চলেছে, তবু আমি তোমায় ভয় করি, তোমার প্রভাবকে ভয় করি। আমার মনে হয়, তাকে যত কঠিন করে গড়ি না তোমার সংস্পর্শে এসে—তোমার প্রভাবে পড়ে সে আবার তার বাল্য-প্রকৃতি ফিরে পাবে, আমার দেওয়া সমস্ত শিক্ষা ভেসে যাবে, আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অতলে তলিয়ে যাবে।

সুরমা নতমুখ তুলিলেন, শূন্যদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যদি আগেকার মত তাকে আমার কাছে টেনে না নেই—?"

পূর্ণ দৃষ্টিতে অবনী রায় পত্নীর পানে তাকাইলেন, বলিলেন, "পারবে

সুরমা? অতখানি সাহস আমার নেই যে তোমায় এ কথা বলি। তাকে মানুষ করতে—তাকে সম্পূর্ণভাবে আমায় তুমি দিতে পারবে কি?"

সুরমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেলেও সে মুখে ফুটিয়া উঠিল দৃঢ়তা—

তিনি উত্তর দিলেন, "পারবো? প্রতিজ্ঞা করছি—তার সঙ্গে আজ হতে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। সে আজ হতে তোমার—সম্পূর্ণ তোমার, আমি তোমায় তাকে দান করলুম।"

ধীর পদে তিনি চলিয়া গেলেন।

হতভাগিনী মা—

এ যে কতখানি দান তাহা বুঝিতে পিতার বিলম্ব হয় নাই।

মেয়েরা সব ত্যাগ করিতে পারে তাহাদের নিজেদের চেয়েও সন্তান মূল্যবান,—নিজেদের তাহারা হত্যা করে, ধ্বংস করে,—কিন্তু সন্তানকে তাহারা রক্ষা করে।

অন্তরের মধ্যে যে ছিল সে স্নেহময়ী জননীকে ফিরাইতে চাহিল,—

কিন্তু বাহিরে যে ছিল সে বাধা দিল। না, মায়ের দুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। মায়ের অত্যধিক স্নেহ সন্তানকে মানুষ হইতে দেয় না, তাহাকে ধ্বংস করে, পিতার শাসন তাই যে দরকার। পিতাকে শক্ত হইতেই হইবে—তাঁহার বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতেই হইবে।

*

*   *

স্বামীর বংশ মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে সুরমা পুত্রের সংস্রব ত্যাগ করিবেন স্বামীকে কথা দিয়াছেন।

কথাটা মুখে বলা যত সহজ কাজে যদি তত সহজ হইত—

মনে পড়ে পুত্রের কথা—

মায়ের সান্নিধ্যে থাকিয়া সে অধঃপাতে যাইতেছে এই ধারণা বাড়ীর সকলেরই মনে জন্মিয়া গিয়াছে! সেই জন্যই মায়ের প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য কত না চেষ্টা করা হইয়াছে;—কত না নির্য্যাতন, কত না শাসন করা হইয়াছে, কিন্তু সে সবই হইয়া গিয়াছে ব্যর্থ; জড়সড়ভাবে তবু সে মায়ের অঞ্চলের তলায় আশ্রয় লইয়াছে।

সেই ব্রজেশ্বর;—

বাড়ীতে পূজার সময় বলি হইত, সে কোনদিন বলি দেখিতে পারে নাই, সে ছুটিয়া পলাইত মায়ের কাছে,—মা তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া লুকাইয়া ফেলিতেন।

ছোটবেলায় সে মায়ের মুখে প্রহ্লাদ, ধ্রুবের গল্প শুনিয়াছে. চৈতন্য দেবের গল্প শুনিয়াছে, মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া কল্পনায় সে নিজেকে ধ্রুব প্রহ্লাদ হইতে দেখিয়াছে।

এতদিন পুত্রকে অবনী রায় কোনদিন নিজের নাগালের মধ্যে পান নাই, যতবার তাহাকে নিজের কাছে ধরিয়া আনিয়াছেন ততবারই সে পলাইয়াছে।

রাগটা যত পড়িত গিয়া সুরমার উপর, সুরমার পিতৃবংশের উপর, নিজের পিতার উপর।

পতা নিজে নিষ্ঠাবান শাক্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতাবলম্বী, সম্পূর্ণ

বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবের কন্যাকে কেন গৃহের বধূ করিয়া ছিলেন? নিষ্ঠাবান শাক্তের গৃহের বধূ হইয়া আসিয়া বৈষ্ণব-কন্যা সুরমাকেও তো বড় কম কষ্ট সহিতে হইতেছে না। দুইটী ধর্ম্মের আঘাত ও প্রতিঘাত অনবরত তাঁহার বক্ষে লাগিতেছে, সে কষ্ট—সে বেদনা তো বড় কম নয়; তথাপি তিনি আজও বর্ত্তমান আছেন, বক্ষ গুঁড়াইয়া গেলেও বাহিরের মানুষের আজও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

সুরমার পিতা আজও বর্ত্তমান, নাই অবনী রায়ের পিতা। যাঁহারা বর্ত্তমান আজও আছেন—তাঁহারাই কার্য্যের ফল ভোগ করিতেছেন, যাহারা ইহার পর আসিবে হয় তো সে কার্য্যের ফল তাহারাও ভোগ করিবে।

আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিতা সুরমা—নিদারুণ বেদনা তিনি মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যান, কাহাকেও কোনদিন ঘুণাক্ষরে জানিতে দেন নাই তিনি কতখানি দিয়া কতখানি পাইয়াছেন।

এ নারীর বুকের অতলতলে কি বেদনা চাপা আছে তাহাও কেহ কোনদিন জানিতে চাহে নাই। বাহির লইয়া সংসার বাহ্যদৃশ্য অটুট থাকিলেই হইল, ভিতর লইয়া যখন কারবার চলে না, তাহার দিকে তাকাইবারও দরকার কাহারও নাই।

বাড়ীতে আত্মীয় আত্মীয়া অনেক, সকলেই চাহিয়া আছেন ব্রজেশ্বরের দিকে—বংশ গৌরব লইয়া অহঙ্কার করেন সকলেই, বংশ-গৌরব লইয়া প্রত্যক্ষ্যে না হোক—পরোক্ষভাবে গৃহিণী সুরমাকে আঘাত দিতেও কেহ ছাড়েন না।

মনে হয়—বাল্যের আশীর্ব্বাদ সুরমাব জীবনে সফলতা লাভ করিয়াছে। ব্রত শেবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন ধরিত্রীর ন্যায় সহ্যশীলা হইতে পারি; গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করিয়াছে—ধরিত্রীর ন্যায় সহ্যশীলা হও—সে প্রার্থনার ও আশীর্ব্বাদের ফল ফলিয়াছে একা সুরমার জীবনে।

অনেকখানি আশা, আনন্দ, উৎসাহ লইয়া সুরমা যেদিন শ্বশুরালয়ে আগমন করেন সেদিনের কথা আজও সুরমার মনে আছে। সেদিন

যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, সে ব্যবহার তাঁহার মনে রক্তের অক্ষরে ছাপা আছে, সুরমা সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন তাঁহার ভবিষ্যৎ কোন ধারায় গড়িয়া উঠিবে।

আজও দিন ঠিক তেমনই চলে, সুরমা যেন সকলকে মায়ামুগ্ধ করিয়া সকলের চোখে ধূলা দিয়া চুরি করিয়া এ বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার এ অপরাধ তাই কেহই ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

তাঁহার একমাত্র আশ্রয়—তাঁহার সকল শোকে সান্ত্বনা ছিল ব্রজেশ্বর। যত ঝড়ই আসুক, যত প্রলয়কাণ্ডই ঘটুক—সুরমা তাহাকে বুকের মধ্যে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছিলেন। কিন্তু এ যে সংসার, নির্ম্মমতায় পূর্ণ, তাই সংসারের প্রলয়ে পক্ষিণীর বক্ষচ্যুত শাবক কোথায় হারাইয়া গেল।

ব্রজেশ্বরের লেখা সব পত্রই তাঁহার কাছে আছে, অতি যত্নে সব গুলি তিনি রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমকার পত্রগুলি ছিল সুদীর্ঘ—কত অসংলগ্ন কথায় পূর্ণ। ক্রমে ক্রমে সে পত্র সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, আজকালকার পত্র অতি সংক্ষিপ্ত, কেবলমাত্র তাহার শারীরিক খবরটাই বহিয়া আনে, মনের খবর মেলে না।

সেই ব্রজেশ্বর—

সেদিনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একখানা মাসিক পত্রে তাহারই লেখা একটি প্রবন্ধ সুরমা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে লেখা পড়িয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পুত্র যে এমন প্রবন্ধ লিখিতে পারে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

মেয়েদের সে সমালোচনা করিয়াছে, পুরুষের তুলনায় মেয়েরা যে অতি হীন এ কথা সে অনেকগুলি যুক্তি দিয়া লিখিয়াছে, অনেক প্রমাণও দিয়াছে। তাহার লেখা হইতে প্রমাণ হয় সে সমগ্র নারীজাতিকে ঘৃণা করে, তাহার জননীও যে এই জাতিরই অন্তর্গত তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রবন্ধটী পড়িয়া সুরমা অনেকক্ষণ আড়ষ্ট নিস্পন্দভাবে বসিয়া ছিলেন।

ব্রজেশ্বরের প্রায় সমবয়স্কা পিসীমা বিনীতা সগর্ব্বে বলিয়াছিল—"সত্যি কথাই লিখেছে। কিন্তু বউদি, মেয়েরাই যে নরকের দরজা খুলে দেয়—কথাটা মিথ্যে নয়। জগতে যত যা অধর্ম্ম কুকর্ম্ম এ পর্য্যন্ত হয়ে আসছে সবই এই মেয়েদের দিয়ে—এ কথা অস্বীকার করবার যো নাই।"

সে ভুলিয়া গিয়াছিল—সেও এই জাতির অন্তর্গত।

সুরমা বিহ্বলভাবে কতকক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া ছিলেন, তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "কথাটা বল্‌লে কেমন করে বিনীতা? মেয়েদের মধ্যে কি খনা, লীলাবতী, সংযুক্তা, সাবিত্রী জন্মায়নি—তাদের নামটা কি মনে পড়ল না?"

পুত্রের সমবয়স্কা ননদকে মানিতে তিনি কোনদিনই প্রস্তুত নহেন।

বিনীতা হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল, "কিন্তু সত্যিই সে সব মেয়েরা জন্মেছে কি না তারই বা কি প্রমাণ পাওয়া যায় বউদি?

বর্ত্তমানে যেমন অতীতকে ভাঙ্গিয়ে মানুষ চলতে চায় প্রতারণার মধ্যে দিয়ে, সে যুগেও যে এ রকম চলত না তাই বা কে বলতে পারে? পাছে মেয়েরা হয়ে ওঠে দুর্ব্বার—পাছে ঘর ছেড়ে বাইরে যায়, পাছে সমান অধিকার চেয়ে বসে, হয় তো সেই কথা ভেবেই সে যুগের মানুষ কল্পনায় গড়েছিল এমনি সব মেয়েদের।"

সুরমা অন্যমনস্ক ভাবে হাতের কাগজখানা নাড়াচাড়া করিতেছিলেন,—বিনীতার কথার উত্তর দেন নাই।

বিনীতা বলিয়াছিল, "যাই বল বউদি, ব্রজেশ্বর অনেক ভাবে, অনেক না ভাবলে কেউ এমন সব খাঁটি কথা লিখতে পারে না। মেয়েদের সম্বন্ধে এ দেশের শাস্ত্রকারেরা অর্থাৎ মুনি ঋষিরা কি বলে গেছেন তা তো জানোই বউদি, সে সব মানো তো?"

সুরমা বলিয়াছিলেন, "মুনি ঋষিদের কথা মানতে গেলে—সে যুগের সে সব মেয়েরা যে সত্যি ছিলেন তা মানতে হয় বিনীতা মানতে হয়—খনা, লীলাবতী, এরা ছিল, সীতা সাবিত্রীর মত মেয়েরাও এ দেশে জন্মেছিল।"

বিনীতা বলিয়াছিল, "এ সব কথা একদিন হবে বউদি, যেদিন ব্রজ আসবে। তার লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবে সেই—আর সেইটাই হবে সব চেয়ে ভালো।"

সুরমা কোন কথা বলেন নাই।

আজ সেই পুত্র আসিতেছে। কতকাল পরে মাতা ও সন্তানে দেখা হইবে, কিন্তু এ দেখায়—এ মিলনে আনন্দ নাই, এ মিলনের কল্পনাতেও জাগিয়া উঠে বেদনা।

আজ মায়ের মনে হইতেছে তাঁহাদের মাতা-পুত্রের মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়াছে অসীম ব্যবধান, এ দূরত্ব কোনদিন আর দূর হইবে না, মা তাঁহার সন্তানকে আর নিজের বুকে ফিরিয়া পাইবেন না। সংসারের পথে চলিতে বুকের মাণিক কোথায় খসিয়া পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর কুড়াইয়া পাওয়া যায় নাই।

মায়ের চোখ জলে ঝাপসা হইয়া যায়।—

*

* *

ব্রজেশ্বর বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দীর্ঘ আট বৎসর পরে সে গ্রামের বুকে ফিরিয়া আসিয়াছে। আট বৎসরের প্রতিদিন সে অন্ততঃ একবার করিয়া জন্মভূমির কথা মনে করিয়াছে।

আজ সন্ধ্যায় গ্রামের বুকে পা দিয়া সে মুগ্ধনেত্রে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার এমন সৌন্দর্য্য সে দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে দেখিতে পায় নাই। শান্ত নীল আকাশে শুক্ল সপ্তমীর বাঁকা চাঁদখানা জাগিয়া উঠিয়াছে, শুভ্র আলো সমস্ত গ্রামের বুকে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। চাঁদের চারিপাশে অনেকগুলি ছোট বড় তারা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মৃদু আলো চাঁদের দৃপ্ত আলোয় মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

ব্রজেশ্বর মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল। গাছের পাতায় শুভ্র চাঁদের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল, মাটিতে পড়িয়া পথের রেখা স্পষ্ট ফুটাইয়া দিতেছিল; পথের ধারে পুষ্করিণীর কালো জলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া স্রোতের তালে নাচিতেছিল। ঝর ঝর করিয়া এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরের ঘর্ম্মসিক্ত ললাট জুড়াইয়া দিয়া গেল।

এই দেশ ছাড়িয়া ব্রজেশ্বর কোথায় ছিল? সুদীর্ঘকাল সে বহুদূরে অনেক লোকজনের মাঝে কাটাইয়া আসিয়াছে। কতবার তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, কতবার কঠোর শাসনশৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে শৃঙ্খল ছিঁড়িতে সে পারে নাই,—সে শক্তি তাহার হয় নাই। ছিঁড়িবার চেষ্টায় বেদনা বাজিয়াছে কেবল পায়েই নয়—অন্তরেও বটে।

আজ এই শান্ত সন্ধ্যার পানে তাকাইয়া শান্ত একটি নারী মূর্ত্তি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি তাহার মা।

মা এতক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পথের পানে তাকাইয়া আছেন, দুই চোখে তাঁহার কি ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিই না ফুটিয়াছে। আট বৎসর পরে তিনি তাঁহার সন্তানকে দেখিবেন, আবার তাহাকে কোলে টানিয়া লইবেন,—কতখানি আশা, কতখানি আনন্দই না তাঁহার মনে জাগিয়াছে।

মা—তাহার সেই মা—

তিনি তাঁহার সন্তানকে কতখানিই না ভালবাসিতেন, এখনও কতখানিই না ভালোবাসেন। মায়ের আশীর্ব্বাদ আজও অক্ষয় বর্ম্মের মত তাহাকে ঘেরিয়া আছে, মায়ের শুভেচ্ছা তাহার পথের সকল বাধা বিঘ্ন সরাইয়া দেয়।

কি শান্ত স্নিগ্ধ সেই মুখখানি, কি শান্ত স্নিগ্ধ সেই চোখ দুইটী।

মহামান্য জমিদার পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ী হইতে হাতী আসিয়াছিল, ম্যানেজার লোকজন লইয়া আসিয়াছিলেন।

ব্রজেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া ম্যানেজার সুবলবাবু বলিলেন, "হাতী এসেছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে—"

ব্রজেশ্বর অন্যমনস্কভাবে ষ্টেশনের বাহিরে মাঠের পানে তাকাইয়াছিল। এই সন্ধ্যায় মাঠের শোভা দেখাইতেছে অতি সুন্দর। সমস্ত মাঠ ধানগাছে ভরিয়া গিয়াছে, কোন কোন জায়গায় কাশবন, তাহাতে অসংখ্য কাশফুল ফুটিয়াছে। বহুদূর হইতে মাতাল বাতাস বহিয়া আসিয়া কাশের গুচ্ছে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—ফুলগুলি নুইয়া পড়িয়া যেন তাহাকে নমস্কার করিতেছে।

সুবলবাবুর কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বর ফিরিয়া তাকাইল, একটু হাসিয়া বলিল, "আমার কিন্তু হাতীতে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো লাগে সুবলবাবু, এমন সুন্দর সন্ধ্যাবেলায় হাঁটতে আমার বেশ লাগে।"

সুবলবাবু বলিলেন, "কিন্তু বাড়ী যে এখান হতে অনেক দূর ব্রজবাবু।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তা হোক্ না অনেক দূর, হাঁটা আমার ধাতে বেশ সয়ে গেছে; আমি হেঁটেই যাব। আপনি বরং হাতীতে উঠে বাড়ী চলে যান,—বাবাকে খবর দেবেন আমি এসেছি।"

স্থূলকায় সুবলবাবু কেবল মাথা চুলকাইতেছিলেন। যে কোন প্রকারেই হোক্ তাঁহার পক্ষে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে, হাঁটিতেও তিনি সম্মত নহেন।

তাঁহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "তাতে কিছু দোষ হবে না সুবলবাবু, আমি বলছি আপনি হাতীতে উঠে যান, আমি এদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি।"

অগত্যা তাহাই করিতে হইল। সুবলবাবু হাতীতে উঠিয়া আগে চলিয়া গেলেন, ব্রজেশ্বর হাঁটিয়া চলিল, সঙ্গে চলিল কয়েকজন লোক। মাঝখান দিয়া প্রশস্ত লাল পথ গিয়াছে, দু' পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত্র। ষ্টেশনের বাহিরে প্রকাণ্ড বড় পুষ্করিণী, এ পুষ্করিণী ব্রজেশ্বরের পিতামহ সাধারণের জন্য দান করিয়াছেন।

দূর-গ্রামের বক্ষে গৃহস্থবধূ তখন সান্ধ্যদীপ জ্বালিতেছে, শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গগণতল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোথায় কোন দেবালয়ে সন্ধ্যারতি হইতেছিল, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

অনেককাল পরে গ্রামের পথে চলিতে ব্রজেশ্বরের বড় ভালো লাগিতেছিল। সে যেন আজ হারানো জিনিষ কুড়াইয়া পাইয়াছে এমনই তাহার মুখের ভাব। চলিতে চলিতে কতবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল—আবার চলিল।

জ্যোৎস্নালোকিত পথে গ্রামের দুই একজন লোকের সহিত দেখা হইল, ভবিষ্যৎ জমিদারকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া তাহারা পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

দূরে সদর দরজার আলো দেখা যাইতেছিল, বাড়ীর ঘরগুলাতে যে সব আলো জ্বলিতেছিল সেগুলাও ক্রমে ক্রমে দেখা গেল।

চিরপরিচিত যে ঘরটীতে আলো জ্বলিতেছিল, মনে হইল তাহারই একটা জানালায় কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ব্রজেশ্বরের মা—

সমস্ত মনপ্রাণ উন্মুখ হইয়া পড়িয়া আছে এই পথের উপরে, জ্যোৎস্নায় হাজার লোকের মাঝখানে তিনি তাঁহার পুত্রকে চিনিতে পারিবেন।

সদর দরজায় দ্বারোয়ান দাঁড়াইয়াছিল, সসম্ভ্রমে সে মাথা নোয়াইল।

সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে বৈঠকখানায় পিতার সহিত দেখা হইল।

অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে তিনি জমিদারির কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, দরজার বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি প্রজা দাঁড়াইয়া, ঘরের ভিতর নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি অনেক লোকই ছিল।

ব্রজেশ্বর পিতাকে প্রণাম করিল।

মুখ তুলিয়া চশমার ফাঁক দিয়া অবনী রায় পুত্রের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। মুখের ভাব তাঁহার এতটুকুও পরিবর্ত্তিত হইল না, শান্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "দুপুরে আসার কথা ছিল যে—"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল, "তুপুরেই আসতেম, কলকাতায় একটা কাজ ছিল, সেই জন্যে দেরী হয়ে গেল।"

কাগজপত্রের দিকে আবার দৃষ্টি রাখিয়া পিতা বলিলেন, "যাক্, তাতে কিছু এসে যায় না, না এলেই ভাবনার কথা হতো। যাও, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা শোনা কর গিয়ে।"

অনেককালের পর ব্রজেশ্বর বাড়ীর ভিতর চলিল—।

সাম্‌নেই বিনীতা।

ব্রজেশ্বর প্রণাম করিতে গিয়া নমস্কার করিয়া ফেলিল।

তাহাতেই খুসি হইয়া বিনীতা বলিল, "যাক্. তোমার মতিগতি ফিরেছে দেখছি ব্রজ, বিদেশে থেকে সত্যিই শিক্ষাটা ভালো হয়েছে।"

আশ্চর্য্য হওয়ার ভাণ করিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "কি রকম?"

বিনীতা বলিল, "এই যে আমার কাছে মাথা নোয়ানো। আট বছর আগে তুমি যেন একটা গুণ্ডা ছিলে ব্রজ। তোমার কাছ হতে একটা নমস্কার নেওয়ার জন্যে সেদিন কত কাণ্ডই না করেছিলুম,— কত তোষামোদ, কত ভয় দেখানো, কত তর্জ্জন গর্জ্জন সব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। একটা দিন আমার পায়ের ধূলো নেওয়া চুলোয় যাক, একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করনি। বাপ্‌রে, কি ছেলেই না ছিলে ব্রজ, হাড় মাস একেবারে জ্বালিয়ে খেয়েছ।"

ব্রজেশ্বর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আর তুমিই বড় কম করেছিলে পিসী, কোথাও এতটুকু তুষ্টামী করলে অমনি গিয়ে বাবাকে বলে দিতে। বাপ্‌স, তোমার মত তুষ্টু মেয়ে জগতে যদি আর একটী দেখে থাকি।"

বিনীতা বলিল, "তোমার কাছ হতে প্রণাম নেওয়ার জন্যে তোমায় প্রণাম পর্য্যন্ত করেছিলুম মনে পড়ে?"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল, "খুব—খুব মনে পড়ে। কিন্তু পিসী হয়ে ভাইপোকে যে প্রণাম করে, বাঙ্গলার ইতিহাসে এ দৃশ্য অতি বিরল— নেই বলিলেই হয়। যাই বল পিসী, বাংলার ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায় ইত্যাদি মহান লোকের পাশেই তোমার নাম

লেখা হবে। সেই অনাগত দিনের জন্যে আমি তোমার একটা ফটো চাই পিসী, দিতে হবে তোমার জীবনীর মধ্যে।"

বিনীতা রাগ করিয়া বলিল, "জ্বালিয়ো না ব্রজ। বেশী লেখাপড়া শিখলে ছেলেরা ভারি বখাটে হয়ে যায় এ কথা মিছে নয়।

ব্রজেশ্বর হাসিয়া বলিল, "আর মেয়েরা যে আরও বেশী রকম বখাটে হয়ে যায় পিসী। দেখনি বলেই তাদের নামটা বলছো না। সে সব মেয়েদের দেখলে তোমার একেবারে চক্ষু স্থির হয়ে যেত।"

বিনীতা বলিল, "ও, তাই দেখেছ বলেই বুঝি অমনি করে যা তা লিখেছ ব্রজ। সে লেখা পড়ে বউদির মনের অবস্থা যা হয়েছিল—"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কি রকম, মা একেবারে আকাশ হতে পড়েছিলেন নাকি? কিন্তু মার কথা তো এতক্ষণ আমার মনেই পড়েনি, এতক্ষণ এসেছি—মা তো এলো না। আট বছর পরে মাকে দেখব, কতখানি আশা নিয়ে আসছি—"

বিনীতা বলিল, "বউদি নিশ্চয়ই পুজোর ঘরে পুজো করতে বসেছে। তুমি বসবে এসো—বউদি এলো বলে।"

কথাটা ভাবিতেও প্রাণে ব্যথা লাগে।

ব্রজেশ্বর কত আশা করিয়া আসিয়াছে তাহার মা জানালায় দাঁড়াইয়া পথের পানে তাকাইয়া আছেন, সে যাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিবেন, সে প্রণাম করিতে যাওয়া মাত্র তিনি পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিবেন, কত কথা বলিবেন—কত প্রশ্ন, অসংখ্য—

সে সব কি স্বপ্ন?

আট বৎসর পরে একমাত্র সন্তান গৃহে ফিরিয়াছে তিনি এ সময় পূজার ঘরে রহিয়াছেন। কই, স্নেহময়ী মা তো পুত্রকে বক্ষে লইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন না। নিভৃত অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় যে আঘাত লাগিল কে জানে,—ব্রজেশ্বর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল।—

বিনীতা বলিল "ঘরে চল ব্রজ—"

"চল—"

বলিয়া ব্রজেশ্বর অগ্রসর হইল।

*

* *

পূজার ঘরের দরজাটা ভেজান ছিল, সামনের বারান্দা দিয়া চলিতে বিনীতা দাঁড়াইয়া বলিল "বউদি এই ঘরেই আছেন ডাকব কি?"

উদাসভাবে ব্রজেশ্বর বলিল, "থাক, মার পূজো আহ্নিক আগে শেষ হোক। ইহকালটাই তো মানুষের সব নয় পিসী, পরকাল নামে একটা কিছু আছে, সেখানে চলবার পাথেয় আগে সঞ্চয় হোক।"

বিনীতা রাগ করিয়া বলিল, "ওই এক অদ্ভুত মানুষ বাপু,—আজও ঠিক সেই এক নিয়মেই চলবেন—এতটুকু ব্যতিক্রম হওয়ার যো নেই? পরকাল আর পরকাল, ইহকালটাকে এমন করে পায়ে দলে পরকালের আশায় ছুটলে কতখানি পাওয়া যায়—শুনি।"

জোর করিয়াই সে ভেজানো দরজাটা ঠেলিয়া খুলিয়া দিল।

সুরমা তখন প্রণাম করিতেছিলেন।

দরজা খোলার শব্দে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দরজায় দাঁড়াইয়া বিনীতা, তাহারই পিছনে দাঁড়াইয়া ব্রজেশ্বর।

অতৃপ্ত দৃষ্টিতে মা পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। দরজার উপরে যে আলোটি দৃপ্তভাবে জ্বলিতেছিল, তাহারই আলো ব্রজেশ্বরের উন্নত মাথায় মুখে আসিয়া পড়িতেছিল।

সুরমা দেখিতেছিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসরের যে বালক ব্রজেশ্বর তাঁহার বুক ছাড়িয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গিয়াছিল তাহার সহিত এ ব্রজেশ্বরের সাদৃশ্য কোথায়।

পরিবর্ত্তন যথেষ্ট ঘটিয়াছে।

সেই কুসুম সুকুমার বালক এখন অমিততেজা পুরুষসিংহ পৌরুষত্ব-ব্যঞ্জক ঔদ্ধত্যের অহঙ্কার তাহার দেহ হইতে, তাহার মুখ চোখ হইতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে দৃঢ়তা—আত্মপ্রত্যয়।

মা যেন নিজের সন্তানকে আজ চিনিতে পারেন না।

অন্তরের আড়ালে চিত্ত কাঁদিল—সে কোথায় গেল, সে—তাঁহার সেই ব্রজ ?

পথ চলিতে চলিতে মায়ের কোল হইতে সে কোথায় পড়িয়া গেল কে তাহাকে কুড়াইয়া পাইল ? মায়ের বুকের আড়ালে সে ছিল অতি কোমল, মায়ের বুকের স্নেহে সে ছিল সিক্ত, আজ বাহিরের সংসার তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া করিয়া তুলিয়াছে কঠিন কর্কশ, তাহাকে দেখিয়া আজ যে চেনা যায় না।

মায়ের চোখে কি বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি—

বিনীতা বলিল, "বেশ বউদি, কতদিন পরে ছেলে বাড়ী এলো, তুমি তখনও কিনা রইলে তোমার সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে। তোমার মতলব খানা কি বল দেখি, সত্যিই কি তুমি এবার সংসার ছাড়বার উদ্যোগ করছো নাকি ?

"সংসার ছাড়া—"

সুরমার মুখে অতি ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

"সে সংসার ছাড়বার মতলব আমার মোটেই নেই বিনীতা,—মানুষ হয়ে সংসারের বুকে যখন জন্মেছি, এতকাল রয়েছি,—এর দেনা আমায় শুধতে হবে বই কি। সন্ধ্যার সময় উতরে যাচ্ছিল, ব্রজের আসার দেরী দেখে সন্ধ্যা করতে বসেছি।"

ব্রজেশ্বর অগ্রসর হইয়া মাকে প্রণাম করিল।

"ভালো আছো মা ? ভারি রোগা হয়ে গেছ, তোমায় দেখে আমি আজ চিনতেই পারছিনে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই অসুখ বিসুখ হয়েছিল, পাছে ভাবি বলে আমায় কিছু জানাওনি—না ?"

এক পা পিছনে সরিয়া গিয়া সুরমা বলিলেন "একটু দাঁড়া বাবা, ওঘরে যাবি চল, এ ঘরটায় আর নাই বা এলি—"

উপস্থিত ঠাকুরঘরে তাহার প্রবেশের অধিকার নাই যেহেতু সে ট্রেনে আসিয়াছে।

ব্রজেশ্বর এত জোরে অধর দংশন করিল যে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল

সে পিছাইয়া গিয়া বলিল, "আমি তোমায় ছুঁইনি মা; তুমি এসো, আমি ওঘরে চললুম।"

সে বিনীতার সঙ্গে চলিয়া গেল।

খানিক বাদে সুরমা আসিয়া যখন তাহার ঘরে উপস্থিত হইলেন তখন ব্রজেশ্বরের স্নান সমাপ্ত হইয়া গেছে।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়াইয়া সে তাকাইয়া আছে জ্যোৎস্নায় পূর্ণ প্রকৃতির পানে।

বিশাল অট্টালিকার একপাশ দিয়া গ্রাম্য নদী বহিয়া চলিয়াছে, অতি শীর্ণা—যেন একগাছি বিশুষ্ক ফুলের মালা। জ্যোৎস্না তাহার বুকের উপর পড়িয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে অতি সুন্দররূপে। নদীর ওপারে অন্ধকার গাছের ঝোপে মাঝে মাঝে দুই একটা পর্ণ কুটিরের কোন ফাঁক দিয়া আলো বাহির হইয়া জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

সে কি কেবল এই গ্রাম দেখিবার জন্যই আসিয়াছে, এই সৌন্দর্য্য, এই জ্যোৎস্নার ঢেউ উপভোগ করা ছাড়া সে কি আর কিছুই পাইবার আশা করে নাই?

ব্রজেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—

বাল্যের স্বপ্ন হারাইয়া গেছে, আজ—কেবল তাহার স্মৃতিটাই মনে পড়ে, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"ব্রজ—"

ব্রজেশ্বর ফিরিয়া দেখিল মা—

আহ্নিকের কাপড়খানা ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন, হাতে একটি ছোট রূপার বাটিতে কি যেন আছে।

অগ্রসর হইয়া আসিয়া সুরমা বলিলেন, "ঠাকুরের চরণামৃতটুকু আগে খেয়ে ফেল ব্রজ, তারপর কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

প্রত্যাঘাত দিবার এমন একটা সুযোগ ব্রজেশ্বর ব্যর্থ যাইতে দিল না, অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠেই বলিল "সে খবরটাও কি পাওনি মা, আমি কিছু মানিনে; দেবতা—স্বর্গ পাপ পুণ্য—?

সত্যই কঠিন আঘাত, সুরমার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল—

যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াই তিনি বলিলেন "মানিস্‌নে ব্রজ—কিছু মানিস্‌নে ?"

ব্রজেশ্বর চোখ ফিরাইয়া বাহিরের পানে তাকাইল, মাথা নাড়িয়া বলিল "না মা, কিছু মানিনে।—"

সুরমা মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর হাতের বাটিটা টেবিলের উপর রাখিয়া বসিলেন।

বাটি রাখায় ঠুন্ করিয়া একটা শব্দ হইতে ব্রজেশ্বর মুখ ফিরাইয়া চাহিল। মায়ের বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া তাহার মনের কাঠিন্য দূর হইয়া গেল।

অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে হাত পাতিল' "দাও মা, তোমার হাত হতে যাই কেন হোক না—আমি নেব, আমি তোমায় কষ্ট দিতে পারব না।"

মা হাসিলেন—

তাহাকে ঠিক হাসি বলা চলে না—মনে হয় বুকের জমাট বেদনা খানিকটা গলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমি তো ও জিনিষ আর হাতে করে তোমায় দিতে পারব না ব্রজ,—যে যা অবিশ্বাস করে তাকে তা বিশ্বাস করাতে আমি চাইনে। কেন চাইনে তাও বলি,—বিশ্বাস কেউ জন্মে দিতে পারে না, কারও কথায় বিশ্বাস টিকে থাকতে পারে না। তুমি তর্ক শাস্ত্র পড়ে আজ যেনেছ দেবতা নেই ধর্ম নেই, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ নরক সবই মানুষের মনগড়া কথা; আজ আমার মনে পাছে ব্যথা লাগে তাই হয় তো জোর করে তুমি বলবে তুমি মানো। কিন্তু এ যে দারুণ মিথ্যা কথা হয়ে যাবে ব্রজ, আমি মা হয়ে তোমাকে এমন একটা মিথ্যাচরণে অভ্যস্ত করতে পারব না তাতে আমি সুখী হব না আরও কষ্ট পাব।"

এক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যে তোমার মাকে চেন না তা নয়। আজ আমায় খুসী করবে মনে ভেবে যদি তুমি তোমার বিরুদ্ধ মতটাকে মেনে নাও, সেটাতে আমায় কেবল অপমানই করা হবে ব্রজ, মায়ের প্রকৃত সম্মান সেটুকুতে পাওয়া যায় না বলেই আমি মনে

করি। তোমার মাকে তুমি অতখানি অপমান করতে পারবে না, এ বিশ্বাস তোমায় আমি করি।"

ব্রজেশ্বর নিস্তব্ধ ভাবে মায়ের পানে তাকাইয়া রহিল।

হাঁ, সে তাহার মাকে চেনে। এ সংসারে কেহ তাহার মাকে চেনে না, এই মানুষটিকে চিনিবার চেষ্টা কেহ কোনদিন করে নাই। স্বামী পর্য্যন্তও নহেন,—না করুক—সে চেনে। মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া সে তাহার মায়ের অন্তরের ছবি দেখিতে পায়, মায়ের সহিত তাহার সত্যকার পরিচয় হয় তখনই।

এই সেই মানুষ, নীরবে সব যে সহিয়া যায়, মুখ ফুটিয়া কখনও তবু নিজের কথা কাহাকেও জানায় না। সে যে অপমান— ব্যক্তিত্বের অপমান, মানুষের অপমান।

মায়ের পাশে বসিয়া সে জিজ্ঞাসুনেত্রে মায়ের পানে তাকাইল।

"আমার ওপর রাগ করনি তো মা—?"

সুরমা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "না ব্রজ, এতে রাগ করবার মত কিছুই নেই। প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের সম্মান আমি দিয়ে থাকি, কেন না আমি নিজের সম্বন্ধে অতি সচেতন, অতি সতর্ক। লোকে বলে জেদ,—হয়তো হবেও তাই, তবু আমার মনে হয় এই জেদকে বাঁচিয়ে রাখা চাই,—সকলেই যেন জেদ বাঁচিয়ে রাখে, জেদকে আমি বলি মনুষ্যত্ব, গৌরব।"

মায়ের কোলে মাথা দিয়ে ব্রজেশ্বর শুইয়া পড়িল, বলিল, "বড় বাঁচানটা বাঁচিয়ে দিলে মা, আমি অনেক কথাই ভাবছিলুম।"

পুত্রের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মা বলিলেন, "কি কথা ভাবছিলি ব্রজ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, প্রথম হচ্ছে আমাকে "তুমি" বলে সম্বোধন। এই সম্বোধন তোমার আমার মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান জাগিয়ে দিয়েছিল, তোমায় আমি হাতড়ে ধরতে পারছিলাম না; তুমি যেন নাগালের অনেক বাইরে চলে গিয়েছিলে। তারপরে আমি ভাবছিলেম

আমার ব্যক্তিত্ব তোমায় অনেকখানি আহত করবে, তুমি হয়তো চোখের জল ফেলবে।"

সুরমার ঠোঁটের উপর দিয়া মৃদু হাসির এতটুকু কম্পন চলিয়া গেল।

তিনি বলিলেন, চোখের জল ফেলাটাই বড় করে দেখেছিস ব্রজ, মানুষের ভেতরে যে কি থাকে সেটা কোনদিন দেখিসনি তো। বাইরেই আড়ম্বরটাই মানুষ খুব বড় করে দেখে, ভেতরটা যদি দেখতো, তাহলে অনেক কিছুরই সন্ধান পেত। মানুষ ভারী বোকা ব্রজ, অথবা বোকার ভাণ করে অনেক কিছু এড়িয়ে চলতে চায়। ওই জন্যেই যে বড় ব্যথা পাই, ওই জন্যেই না সময়ে সময়ে চোখের জল এসে পড়ে। কিন্তু ওসব কথা যাক, সেখানে ভালছিলি তো, কোন অসুখ-বিশুখ হয়নি ?"

মা যে উণ্মুখ কথাগুলিকে চাপা দিলেন তাহা ব্রজেশ্বর বেশ বুঝিল।

বলিল, "অসুখ-বিশুখ হলে কি খবর পেতে না মা ? ভালো অবস্থায় যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে থাকা চলে, অসুখ অবস্থায় কোথাও ভালো লাগে না মা, কাউকে পছন্দ হয় না—"

গভীর স্নেহে মায়ের দুটি চোখ পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি ব্রজেশ্বরের মাথায় নীরবে কেবল হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

*

* *

সবই ভালো হয় গোল বাধে মায়ের অতিরিক্ত নিষ্ঠা লইয়া।

মাকে কাছে পাইয়াও ব্রজেশ্বরের মনে হয় মায়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে মাকে সে দেখিয়া গিয়াছিল, সে মাকে সে ফিরিয়া পাইল না।

মা হাসেন কথাও বলেন—সবই নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে, ধরা ছোঁয়া দেন না কাছে আসিয়াও অনেক তফাতে সরিয়া যান।

মাতা পুত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে তাহাদেরই গৃহদেবতা—

এক এক সময় ইচ্ছা হয়, মা যখন চুপ করিয়া ঠাকুরের সামনে বসিয়া থাকেন তখন সে জোর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং মায়ের

সামনেই সে পাথরের বিগ্রহটার মাথায় লগুড়াঘাত করিয়া মাকে জানাইয়া এবং বুঝাইয়া দেয়, পাথরের মধ্যে দেবতা নাই, দেবতা কোন কিছুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

কতদিন সে চুপ করিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে মা চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, পাথরের ঠাকুর তেমনই নিশ্চলভাবে রহিয়াছে।

এ মূর্ত্তি আগেও ছিল, আজও আছে। একদিন মায়ের দেখাদেখি সেও তাহার সমস্ত বিশ্বাস একান্ত নিষ্ঠা দিয়া এই পাথরের মূর্ত্তিটাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, আজ সেদিনের কথা মনে করিতেও হাসি পায়।

আজ মনে হয় সেদিন সে কি ছেলেখেলাই করিয়াছে? কি পাইয়াছিল সে কি দেখিয়াছিল উহার মধ্যে—?

আশ্চর্য্য হয় মাকে দেখিয়া—

আগে তো মা এমন সর্ব্বত্যাগিনীর মত এই মূর্ত্তিটাকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন নাই! আজ তাঁহার এই একাগ্রতা ব্রজেশ্বরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

দুরন্ত আশা মনে জাগে—মূর্ত্তিটাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া মাকে জানাইয়া দেওয়া চাই মানুষের শক্তি কতখানি, মানুষ কি না পারে। ওই মূর্ত্তিটা তৈয়ারী হইয়াছে মানুষেরই হাতে, আজ সে মানুষেরই হাতের পূজা পাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে—ইহাই না হাসির কথা।

উহার শক্তি কতটুকু? যে মানুষ ওই মূর্ত্তির রূপ দিয়াছে, সেই তো উহাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতে পারে। দেবতা? কোথায় দেবতা? মানুষের শক্তির জয় হোক সে সমস্ত অন্ধকার মুছিয়া দিবে, মানুষের স্বত্বা জগতে একমেব দ্বিতীয়ম্ নাস্তি বলিয়া প্রচার করিবে।

কতবার সে আগাইয়া গিয়া আবার পিছাইয়া পড়িয়াছে।

সংস্কারে হয় তো বাধে।

কিছু নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেও কি জানি কোথা হইতে একটা প্রশ্ন জাগে—সত্যই কিছু নয় কি?

সত্যই কিছু হয় তো নয়—কিছু তাহার মা তো পরম সত্য। ওই যে মানুষটী সংসারের সব কথা ভুলিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে হাত দু'খানা যোড় করিয়া ওই বিগ্রহের সামনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, উঁহাকে তো মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ওই মানুষটীর মনে ব্যথা দেওয়া চলে কি? উঁহার সংস্কারে আঘাত দেওয়া যায় কি?

হাঁ, ও মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিলে তিনি একটী কথাও বলিবেন না, একবার কৈফিয়ৎ চাহিবেন না যে কেন সে এ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিল। পৃথিবীতে উনিও অনেক পাওয়ার আশা লইয়া চলিয়াছিলেন, কিছুই পান নাই বরং পৃথিবী তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া তাঁহাকে রিক্তা সাজাইয়াছে।

দুনিয়ার ছোট বড় সব ক্ষতি যেমন করিয়া তিনি সহ্য করিয়াছেন এ ক্ষতিও তেমনই সহ্য করিয়া যাইবেন। বুকটা চামড়ার আড়ালে গুঁড়াইয়া যাইবে বাহিরে তিনি থাকিবেন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার।

ব্রজেশ্বর ফিরিয়া আসে, হাতের লাঠি ঘরের মেঝেয় পড়িয়া থাকে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া বাড়ী আসিয়া সে সুরমার দেখা পাইল না, ঠাকুরঘরের দরজা বাহির হইতে শিকল বন্ধ, তবুও সে দরজা খুলিয়া উঁকি দিল।

সিংহাসনের উপর রহিয়াছে বিগ্রহ।

ব্রজেশ্বরের চক্ষু দুইটী দৃপ্ত হইয়া উঠে।

নির্জ্জন অবসর কেহ কোথাও নাই অনায়াসে সে সিংহাসন লইয়া বাড়ীর পিছনে দিঘীতে ডুবাইয়া দিতে পারে।

পাথরের দেবতা—চীৎকার করিয়া ডাক তোমার সেবিকাকে, তোমার একান্ত ভক্তাকে, সে তোমায় রক্ষা করুক—তোমার মর্য্যাদা রাখুক।

ব্রজেশ্বর দুই পা অগ্রসর হইল—

সিংহাসনে দেবতা—

না দেবতা নয়, পাথরের বিগ্রহ, কিন্তু উঁহাকে দেবতার আসন দিল কে, সে মানুষ,—সে ব্রজেশ্বরের মা।

তুচ্ছ ওই সিংহাসন, তুচ্ছ ওই দেবতা, মানুষের শক্তি সিংহাসনশুদ্ধ দেবতাকে এক নিমেষে গুঁড়াইয়া দিতে পারে,—কিন্তু ওই সিংহাসন ঘেরিয়া আছে মানুষেরই প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা।

মূল্য তাহারই বেশী, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠাই দেবতা গড়ে, স্বর্গ গড়ে; নহিলে কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কোথায় দেবতা আর কোথায় সয়তান?

ব্রজেশ্বর নিতান্ত নির্জীব ভাবে তাকাইয়া রহিল।

চুরি করিতে আসিয়া চোর যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আচ্ছা, থাক দেবতা,—একদিন আসিবে যেদিন ব্রজেশ্বর প্রমাণ দিবে তুমি দেবতা নয় তুমি পাথর—কেবল পাথর।

ব্রজেশ্বর যেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া আবার দরজার শিকল তুলিয়া দিল। একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল কেহ—বিশেষ করিয়া মা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন কিনা।

মা কোন দিকে নাই,—

হাল্‌কা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রজেশ্বর নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

মাকে যে এমন করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে ব্রজেশ্বর ক্ষমা করিতে পারে না, কিছুতেই না।

আজ কয়দিন সে যে আসিয়াছে, মাকে সে নিজের কাছে পায় নাই। মা নিজেকে ধরা দেন নাই, অনেকটা এড়াইয়া চলিয়াছেন, মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেন, সে হাতে তেমন গভীরতম স্নেহের স্পর্শ ব্রজেশ্বর আর পায় না।

ব্রজেশ্বর অধীর হইয়া উঠে।

মা যেন দুঃখ বেদনা আনন্দের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। সে কোন্ রাজ্য—যেখানে গেলে সংসারের আকর্ষণ পিছনে অনুসরণ করে না?

ব্রজেশ্বর আজও ভাবিতেছিল সে চলিয়া যাইবে—এখানে থাকিবে না। কলিকাতায় বন্ধু অমর একটা কাজ লইবার কথা বলিয়াছে, ব্রজেশ্বর সেই কাজই লইবে।

বাহিরে আকাশ তখন কালো মেঘে ঢাকিয়া গেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে ছিল। জানালাপথে সে আলো ভিতরে আসিতেছিল, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল।

ব্রজেশ্বর ঘরের আলো নিভাইয়া দিল।

*

* *

নিজের ঘরে বসিয়া বিনীতা বই পড়িতেছিল।

বই পড়ার ঝোঁক তাহার অত্যন্ত বেশী। চার বৎসর হইল সে বিধবা হইয়া ভ্রাতৃ-আলয়ে আসিয়াছে, সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে এক আলমারী বই।

সংসারের সহিত সংস্রব তাহার খুবই কম—যদিও অধিকাংশ সময় সে সংসারের কাজেই কাটাইয়া দেয়। জীবনে সে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে পড়িতে, এখানেও তাহাই করে।

স্বামী ছিলেন লক্ষ্ণৌ কলেজের প্রফেসার। নিজে তিনি অনেক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, স্ত্রীকেও তিনি কয়েকটী ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে সে বই পড়িতেছিল,—ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া সে বই বন্ধ করিল।

ব্রজেশ্বর উঁকি দিয়া বইখানা দেখিয়া লইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "সর্ব্বনাশ, এসব বই পড়ছো যে পিসী, এ যে নীট্‌সের লেখা—"

একটু হাসিয়া বিনীতা বলিল, "নীট্‌সের লেখা পড়তে নেই বুঝি ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "থাকবে না কেন, তবু ওটা যে দারুণ দর্শনতত্ত্ব, অত বড় দার্শনিক তো আর নেই।"

বিনীতা বলিল, "চমৎকার জিনিষ।"

ব্রজেশ্বর তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বুঝতে পারো—?"

বিনীতা বলিল, "কেনই বা পারব না? দর্শনশাস্ত্রটা আমাদের কাছে একেবারেই তো অপরিচিত নয় ব্রজ। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা যেমন—দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেছেন, আমাদের দেশেও কি তেমন কোন দার্শনিক জন্মাননি? শঙ্করাচার্য্যের দর্শন পড়েছো নিশ্চয়—"

ব্রজেশ্বর বলিল, "পড়লেও মনে জাগিয়ে রাখা চলে না পিসী। জগৎ মিথ্যা, যা দেখছি সব মিথ্যা—এ সব বড় বড় কথা বড় বড় লোকের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমি জানি, জগৎ মিথ্যা হয়ে গেলে আমিও মিথ্যা হয়ে যাই,—আমার আমিত্বকে—এত বড় স্বত্ত্বাকে মিথ্যা বলে আমি কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারিনে—সে তুমি যাই বল।"

বড় বড় চোখ দু'টি বিস্ফারিত করিয়া বিনীতা বলিল, "অতএব তুমি কবি—?"

সবেগে মাথা দুলাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "মোটেই না, কবি আমি নই পিসী। কবিত্ব আমি দেখতে পারিনে; কল্পনা নিয়ে দিন কাটায় বলে কবিদের আমি ঘৃণা করি! বাস্তব নিয়ে ক'জন লোক কবিতা লেখে বল তো? হয় তো যখন ঝড় বইছে, ওরা লেখে তখন শান্ত পৃথিবী, কান্নার মধ্যে ওরা দেখে হাসির সৌন্দর্য্য,—যত সব কল্পনা বই তো নয়।

বিনীতা বলিল, "তবু ওরাই সুখী ব্রজ, অভাবের সময় গায় প্রাচুর্য্যের গান. ধ্বংসের মধ্যে দেখে গঠনের বিচিত্র কৌশল, ঝড়ের তাণ্ডব নর্ত্তনে দেখে শান্ত রূপের বিকাশ! আকাশে কালবৈশাখীর কালো মেঘের মধ্যে ওরা দেখে কালো মেয়ের কালো চুলের সৌন্দর্য্য, ধ্বংসের চীৎকার মনে করে শ্যামের বাঁশীর সুর। চমৎকার—ওরাই সুখী। কবিতা পড়ে কত লোক মুগ্ধ হয় জানো?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তাদেরও আমি ঘৃণা করি। মানুষের দেহের দিকে তারা চায় না, শ্রেষ্ঠ শক্তি দৈহিক বল তারা দেখে না, মানসিক শক্তি চালনার তৎপরতার ফলে দেহ হয়ে পড়ে দুর্ব্বল। একদিন নিতান্ত

অসময়ে ভেঙ্গে পড়ে যায় ঝড়ে-উপ্ড়ে যাওয়া লতাটির মতই। ডাক পিসী তোমার কবিদের, দিক তারা আমার কাছে তাদের শক্তির পরিচয়, তবে বুঝব হাঁ—তারা মানুষ। বুঝলে পিসী, আমরা কল্পনারাজ্যে বাস করিনে, ভাব বিলাসে দিন কাটিয়ে দেইনে, কিন্তু আমরা মানুষ—সত্যকার মানুষ। কোথাও প্লাবন হলে—কোথাও ভূমিকম্প হলে—আমরাই করি কাজ, আর তোমার কবিরা গাঁথেন ওদের দুঃখ বেদনা আর চোখের জল দিয়ে মালা।"

তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বিনীতা শান্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "Do not Lose your temper my boy, একটু ধৈর্য্য ধর। তারা যে মালা গাঁথে, তার চিহ্নও তো থাকে, সে ফুল সহজে শুকায় না। কতদিন কত বৎসর কেটে যাবে, সে মালার ফুল থাকবে অমনি অম্লান গন্ধে পূর্ণ, সেটাও তো কবির পক্ষে বড় কম গৌরবের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা পড়েছ—'আজি হতে শত বর্ষ পরে' তুমি কি মনে কর কবিতা লেখা এবং রেখে যাওয়া কবির পক্ষে গৌরবের কথা নয়?"

ব্রজেশ্বর হাতযোড় করিল, "রক্ষা কর পিসী, ও সব প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও—ভালো লাগে না। সেকালের লেখক—যেমন বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধু রমেশ দত্ত ইত্যাদি অনেকের লেখায় তবু একটা সত্য আছে, তাঁরা সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র বর্ত্তমানকে চরম এবং পরম সত্য বলে আঁকড়ে ধরে নূতন ধরনের কতকগুলো লেখা উগ্রে দেন নি। আজকালকার দিনে যে সব লেখা চোখে পড়ে, তুমি কি মনে কর এ সব টিকে থাকবে? এ শতাব্দী কেটে গেলে বর্ত্তমান যুগের এই সব লেখকদের সন্ধান কি পরবর্ত্তী যুগে মিলবে?

একটু হাসিয়া বিনীতা বলিল, "নাই পাওয়া গেল তাতেই বা কি? ভুল বুঝোনা ব্রজ, মনে কর যে ফুলটি ফোটে, সে তার ফোটার সার্থকতা নিয়েই আনন্দ পায়, গর্ব্ব অনুভব করে; তারপরে সে শুকাবে—ঝরে পড়বে, লোকে তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে—যাক, সে ব্যথা অনুভব করার শক্তি তার নাই বা রইল। আনন্দ পাওয়া এবং

পরিবেশনের মধ্যে যা পাওয়ার আনন্দ তা এঁরা পাচ্ছেন, পরে থাকলো বা নাই থাকলো। ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার, আলোকময় বর্ত্তমান নিয়েই না জগৎ। তুমি জন্মেছ, আমি জন্মেছি, আমরা পৃথিবীর যেটুকু উপভোগ করতে পাই, নিঃশেষে তাই নিয়ে চলি—পরের ভাবনা ভাবে কে? আমাকেই যখন মরতে হবে, আমারই যখন শেষ হয়ে যাবে, আমার কাজ যে অনন্তকাল স্থায়ী হবে, সে কল্পনা করাও অনুচিত।”

ব্রজেশ্বর নিস্তব্ধে বসিয়া সামনের বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

বিনীতা বলিল, “বর্ত্তমানের সমালোচনা করবার right তোমার আছে, আমারও আছে, তাই কর—আমিও করি। শতাব্দী পরে এদের মধ্যে কতজনের লেখা বেঁচে থাকবে’ পাঠ্যপুস্তকে ছেলেরা পড়তে, মুখস্থ করতে বাধ্য হবে তার খবর রেখো না। বঙ্কিম, দীনবন্ধু মাইকেল, রমেশচন্দ্র যেমন শতাব্দী পরেও রয়ে গেছেন,—এঁদের নূতন সকলের না হোক কারও কারও লেখা যে এদের শতাব্দী পরেও নূতন করে রাখবে সে সন্দেহ তোমার থাকতে পারে, আমার সে সন্দেহ নাই।”

ব্রজেশ্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বাংলার দুর্ভাগ্য। বাস্তবিক বাংলার জন্যে আমি ভাবি পিসী। ওখানে থাকতেও বাংলার অনেক পত্রিকা পৌঁছাত, তাতে অনেক লেখা পড়তেম; পড়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকতেম। বাংলায় সবাই কবি—সবাই গল্প উপন্যাস লেখক তবে পড়ছে কারা?”

বিনীতা বলিল, “তোমার আমার মত লোক। তুমি তবু দু’ একটা প্রবন্ধও লিখেছ, আমি আবার মোটে কলমই ধরিনি এটুকুই যা তফাৎ। তবু ওই যে কলম ধরিনি, তারই জন্যে নির্ভীক সমালোচনা করবার অধিকার আমার আছে, লিখবার যোগ্যতা থাকলে সে অধিকার থাকত না। ওরা মালা গাঁথবে, আমরা গলায় পরব—আমরা সমালোচনা করব, সেইটাই হবে আদত জিনিষ। সবাই তো লেখেনা ব্রজ, পড়বার লোকও আছে বই কি।”

ব্রজেশ্বর বলিল, "দশ বছর পরে পড়বার জন্যে কেউ থাকবে না, সবাই লিখবে।"

বিনীতা বলিল, "সে তো আরও ভাল কথা, অন্ততঃপক্ষে এতটুকু শক্তি না থাকলে তো লিখতে পারবে না সে কথা স্বীকার কর। বাংলা ভাবপ্রবণ দেশ, সেজন্যে কবিতার আদর যদি এখানে বেশী হয়, গল্পকে সবাই যদি অন্তরে বরণ করে নেয়, সেটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হবে না ব্রজ। দশ বছর পরে যদি বেঁচে থাকি, দেখতে পাব এতটুকু ছেলেটা পর্য্যন্ত লিখছে—বাস্তবিক ভারি আনন্দ পাব।"

ব্রজেশ্বর হাল ছাড়িয়া দিল—"না, তোমার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই পিসী, আমি পরাজয় মানছি।"

যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বিনীতা বলিল, "বাঃ, পরাজয় কিসের? আমার তো মনে হয় না ব্রজ, আমরা তর্ক করছি, তবে এতে জয় পরাজয়ের কথাই বা উঠছে কেন? এর নাম কথাবার্ত্তা—Logic নয়।"

ব্রজেশ্বর হাসিল—

"আচ্ছা পিসী, তোমার স্বামী নিশ্চয়ই তোমায় Logic পড়াতেন, না?"

গম্ভীর হইয়া বিনীতা বলিল, "মোটেই নয়। আমার সময়ই বা কোথায় ছিল—তাঁরই বা কোথায় সময়? কিন্তু সে সব কথা ছেড়ে দাও ব্রজ,—এখানকার কথায় এসো। হাঁ, তোমার প্রবন্ধ, যেটা, মেয়েদের নিয়ে লিখেছিলে, সেটা পড়ে তোমার মা কতখানি মর্মাহতা হয়েছেন জানো? তুমি যে তোমার মাতৃজাতিকে এমন ভাবে অপমান করতে পারবে, কোনদিন তিনি তা স্বপ্নেও ভাবেননি।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "জাতির অপমান করিনি পিসী, বর্ত্তমানে মেয়েদের শিক্ষার কথা তুলে ওদের উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে তারই আলোচনা করেছি। তুমিই বল দেখি পিসী, অনেক দেখছো, শুনছো, তুমিই বল—আমার লেখাটা কি অযৌক্তিক হয়েছে?"

বিনীতা বলিল, "হয় তো যুক্তিপূর্ণ ই হয়েছে, কিন্তু তবু তোমার লেখা উচিত হয়নি ব্রজ। তোমার মা এতে কতখানি ব্যথা পেয়েছেন তা তুমি—"

অসহিষ্ণুভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "আঃ, বার বার তুমি ওই একই কথা তুলো না পিসী। মা কিসে সন্তুষ্ট হন শুনি? মায়ের ঠাকুরকে প্রণাম না করলে মা অসন্তুষ্ট, প্রসাদী চরণামৃত না নিলে মা অসন্তুষ্ট, মেয়েদের সম্বন্ধে যথার্থ কথা বললেও মা অসন্তুষ্ট। অতএব বল, মায়ের অসন্তুষ্টির ভয়ে আমায় আমার ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সব রকমে ওঁর উপযুক্ত হয়ে ওঁকে খুসি রাখতে হবে। কিন্তু সেটী হচ্ছে না পিসী; আমাদের এ বংশের ছেলে কোনদিন মেয়েদের কথা শুনে নিজের মত জলাঞ্জলি দেয়নি, নিজেদের ব্যক্তিত্ব তারা বজায় রেখে গেছে—আজও রাখবে। আমি যা ভালো বলে মনে করি—যা ভাল বুঝি তাই করে যাব। হোক তিনি মা, হও তুমি পিসী, তোমাদের কারও কথা শুনতে বাধ্য নই।"

এই কথাটাই এতদিন সে অনেক চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারে নাই, আজ মুখ খুলিয়া বলিয়া সে নিজেকে মুক্ত মনে করিল, এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিনীতা তীব্র দৃষ্টিতে ব্রজেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটি মাত্র শব্দ তাহার মুখে ফুটিল—"ছিঃ—"

এই ধিক্কারে ব্রজেশ্বর যেন মাটিতে মিশাইয়া যায়।

জোর করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব, পৌরুষত্ব বজায় রাখিবার জন্য সে বলিল "কেন, ছিঃ কিসের পিসী?"

বিনীতা টেবিলের উপর হইতে বইখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "কেন সে কথা আর নাই বা বললুম ব্রজ, তুমি নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখ গিয়ে। তবুও যদি বুঝতে না পার—সেদিন আসুক, তোমায় বুঝিয়ে দেব।"

ব্রজেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল—

বিনীতা আড়চোখের দৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, মুখখানা অন্ধকার করিয়া ব্রজেশ্বর বাহির হইয়া যাইতেছে।

*

*   *

ছাদের উপর চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন একা সুরমা।

অমাবস্যা কাটিয়া গিয়াছে, আবার আসিয়াছে শুক্লপক্ষ, আবার চারিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে।

দূরে কোথায় একটা পাখী অনবরত চিৎকার করিতেছিল, চারিদিকে তাহার মিষ্টি সুর ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

দীর্ঘকাল পরে পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে, মা পুত্রকে নিজের বলিয়া টানিয়া লইতে পারিলেন না, মাঝখানে রহিয়া গেল অসীম অনন্ত ব্যবধান।

যে ব্যবধান জাগিয়া উঠিয়াছে ইহা আর কোনদিন দূর হইবে না, চিরদিনই থাকিয়া যাইবে।

স্বামীর বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে স্ত্রী, সন্তান ত্যাগ করিবেন, যাঁহার সন্তান তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। তিনি সংসার হইতে চিরদিন দূরে রহিয়াছেন, দূরেই থাকিবেন।

বড় একা বলিয়া মনে হয়।

যখন এই একাকীত্বের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখন প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে।

সুরমা ভাবেন পিত্রালয়ের কথা; সেখানে ফিরিয়া গেলে হয়, এখানে এমন ভাবে আর কতদিন থাকিতে পারিবেন?

পিত্রালয়ের কথা ভাবিতে মনে পড়ে বিবাহ-রাত্রির কথা।

সে রাত্রে বাসরঘর একে একে জনশূন্য হইয়া গেল, গৃহে রহিলেন কেবল স্বামী ও স্ত্রী।

স্ত্রীর পানে তাকাইয়া স্বামী বলিয়াছিলেন, "একটা কথা সর্ব্বদাই মনে রেখো সুরমা, তোমায় বিয়ে করছি আমার বাপ মায়ের তুষ্টির জন্যে—নিজের জন্যে নয়। তোমায় সর্ব্বাংশে তাঁদের সংসারের উপযুক্ত

হতে হবে, এর জন্যে তোমায় ত্যাগও করতে হবে অনেকখানি, বল তুমি তা' করতে রাজি আছ—পারবে ?"

সেই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত সচকিত হইয়াই সুরমা স্বামীর পানে তাকাইয়া ছিলেন, খানিকক্ষণ কি ভাবিয়াছিলেন।

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "এ কথাও মনে কোরো—রাজি না হওয়া ছাড়া তোমার আর উপায় নেই। তুমি সুন্দরী বলেই আমার বাবা তোমায় নিজের ঘরে নিচ্ছেন এ কথা নিশ্চয়ই জেনো। বুঝবার বয়স তোমার হয়েছে, নিশ্চয়ই বুঝেছ—আমাদের বংশের বধূ হতে গেলে, আমাদের ঘরে যেতে হলে অনেকখানি সৌভাগ্য সঙ্গে আনা দরকার। বাবা চাণক্যের নীতি অনুসরণ করেছেন। নীচ স্থান হতে সোণা এবং নারী গ্রহণ করা চলে, কেবল তাকে ঘষে মেজে শিক্ষা দিয়ে নিতে হয় মাত্র। আমি আশা করছি তোমা হতে আমাদের বংশ-গৌরব নষ্ট হবে না,—বল—তুমি রাজি ?"

সুরমা স্বামীর পায়ের উপর অচল দৃষ্টি রাখিয়া স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন, "রাজি।"

তরুণ হৃদয়ের আশা আনন্দ সাধের সেদিন সমাধি দিলেন, সুরমা সেদিন হইতে এ বংশের বধূ, আর কিছু নহেন।

পিত্রালয়ের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নাই। পিতা তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কতবার লোক পাঠাইয়াছেন, সুরমা যান নাই। চোখের জলে ভিজাইয়া পিতাকে পত্র লিখিয়াছেন, নবদ্বীপের কোন লোক যেন এ বাটিতে আর না আসে। তিনি শাক্তবংশের বধূ, মহামান্য জমিদার মহাশয়ের পত্নী, দরিদ্র বৈষ্ণবচূড়ামণি রামজয় তর্কলঙ্কারের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে সেইদিন, যেদিন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

তাহার পর মায়ের মৃত্যুসংবাদ, ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ সবই কাণে আসিয়াছে, ভ্রাতৃবধূর ধর্মান্তর গ্রহণের বার্ত্তাও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, সুরমা অতি গোপনে ঘরের কোণে থাকিয়া চোখের জল মুছিয়াছেন।

বৃদ্ধ পিতা আজও বর্ত্তমান।

আজও তিনি টোলে অধ্যাপনা করেন, কন্যার নাম মুখেও আনেন না। নিশ্চয়ই তিনি মনে করেন তাঁহার একমাত্র কন্যাও মরিয়া গিয়াছে, জীবন্ত কন্যার স্মৃতি তাই তাঁহার মনে নাই।

আজ সুরমার মনে পিতার সেই দেবতুল্য শান্ত মূর্ত্তিটাই জাগিয়া উঠিতেছিল।

আজ জুড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই, আছে একমাত্র পিতার চরণ। তাহাতেও কি তাঁহার অধিকার আছে,—পাইবেন কি? পৃথিবীতে আসিয়া এমন কোনো মেয়ে আছে যে তাঁহার মত সব হইতে বঞ্চিতা হইয়াছে।

মাথার উপর দিয়া একটা কি পাখী অতি কর্কশ শব্দে ডাকিয়া গেল।

সে শব্দে চম্‌কাইয়া সুরমা উঠিয়া বসিলেন, পিছনে দৃষ্টি পড়িতে দেখা গেল, ব্রজেশ্বর প্রাচীরে ভর দিয়া দূরের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে।

সে আসিয়াছিল মায়ের কাছে, মাকে অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে মাকে ডাকে নাই।

"ব্রজ—"

মায়ের ডাক ব্রজেশ্বরের কানে পৌঁছাইল না। সুরমা আবার ডাকিলেন, "ব্রজ—"

ব্রজ নির্ব্বিকার।

সুরমা মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর উঠিয়া আস্তে আস্তে ব্রজেশ্বরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজেশ্বর মুখ ফিরাইয়া মায়ের পানে তাকাইল, তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, দৃষ্টি উদাস।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ এসেছিস ব্রজ?" চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস, কই আমায় একবারও ডাকিস্‌নি তো?"

ব্রজেশ্বর উদাসভাবেই বলিল, "কি করে ডাকব মা? তুমি যেরকম সমাধিমগ্ন ছিলে তাতে ডাকতেই আমার ভয় হচ্ছিল।"

"সমাধিমগ্ন –"

মা চুপ করিয়া রহিলেন—

ব্রজেশ্বর বলিল, তা ছাড়া আর কি বলব মা।"

সুরমা পুত্রের মুখের পানে তাকাইলেন, পুত্র আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

সপ্তমীর চাঁদ তাহার চলার পথ বাহিয়া চলিয়াছে, সমস্ত আকাশ চাঁদের শুভ্র আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে আলো কেবল আকাশেই সীমাবদ্ধ নাই, সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই করিয়া তুলিয়াছে অতি সুন্দর—অতিরমণীয়।

ব্রজেশ্বর চোখ নামাইয়া দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর রাখিল,—

"একটা কথার উত্তর দাও মা, আমার দিব্যি—তুমি খানিকক্ষণের জন্যে আমার কাছে সহজ হও--সরল হও। এক মাসের উপর আমি এসেছি, তোমায় কেন আমি তেমন করে নিজের মধ্যে পেলেম না, কোথায় তোমায় হারিয়ে ফেল্লেম তা আমায় বলে দাও! তোমার আমার মাঝখানে এ ব্যবধান গড়ে দিলে কে—তোমার দেবতা—তোমার ধর্ম্ম, তোমার স্বর্গ কি?

সুরমা বিবর্ণ মুখে বলিলেন, ব্যবধান জাগানো—কই না?

ব্রজেশ্বর বলিল, বুঝছো কিন্তু ধরা দিচ্ছ না। তা হলে এ ব্যবধান তুমিই জাগিয়েছ!"

"আমি, তুই বলছিস কি ব্রজ—?"

সুরমা বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করিলেন।

দৃঢ়কণ্ঠে ব্রজেশ্বর বলিল, হ্যাঁ, তুমিই জাগিয়েছ মা! আট বছর পরে সেদিনে সন্ধ্যায় যখন ফিরে এলেম—কই, সেদিন তো আমায় কোলে টেনে নিলে না? কতখানি ব্যগ্রতা নিয়ে আমি পথ চলেছিলাম তা কি জানো মা? কত দূর হতে আমি চেয়েছিলাম তোমার ঘরের জানালার দিকে, ভাবছিলেম আমার মা আমার পথের পানে চেয়ে ওই জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু সে যে মিথ্যে আশা তা তো আমি জানতেম না মা। তোমার পাথরের ঠাকুর তোমায় তখন নিজের কাছে আটক করে রেখেছিল, তাই আমার অন্তরের ডাক তোমার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি।"

সুরমা আহত হইয়া বলিলেন. "তোর যত রাগ কি ওই দেবতার উপরেই ব্রজ ?"

"দেবতা—"

ব্রজেশ্বর তর্ক করার সূত্র পাইল,—সে যেন দশখানা হইয়া উঠিল ; দৃপ্ত মুখে সে বলিল, "দেবতা কথাটা আর বলো না মা। মাটির পুতুল, পাথরের পুতুল যদি দেবতা হয়, তাহলে তোমার পায়ের তলায় যে মাটি রয়েছে সে'ও তো দেবতা। ছেলেপুলের হাতে কত পাথরের পুতুল থাকে, তাদের গায়ে কতবার পা লাগে, কই, এ কথা তো আমার জানা ছিল না।"

সুরমা ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "হয়তো আমাদের ভুল ধারণা, তাই একটীর মধ্য দিয়ে সকলই পেতে চাই। পুতুল যে সে পুতুল, ভক্তি শ্রদ্ধা বা মন্ত্র পড়ে তাকে তো দেবতার আসন দেওয়া হয়নি ব্রজেশ্বর —সেই জন্যেই পুতুলকে আমরা নমস্কার করতে পারিনে।"

ব্রজেশ্বর মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "মন্ত্র আবাহন আর ভক্তি ; চমৎকার কথাই বলেছ মা। তোমাদের শাস্ত্রেই বলে না, ভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তবে ওই নির্দ্দিষ্ট একটা আধারকে বৈচিত্র্যময় করে গড়ে মন্ত্র দিয়ে তাকে আবাহন করার মানেটা কি বলতে পারো ? মনকে চোখ ঠেরে শান্ত রাখবার উপাদান অনেক কিছুই তো মেলে, এ সব গাঁজাখুরি ব্যাপারের দরকার কি ?"

সুরমা বলিলেন, এ কথা সত্যি ব্রজ, হিন্দু জানে সর্ব্বভূতে ভগবান বিরাজ করেন, সব কিছুর মধ্যেই এরা ভগবানের অস্তিত্ব তাই মেনে নিয়েছে। আমি তোদের মত অত লেখাপড়া শিখিনি ব্রজ, শাস্ত্রের কথা যেটুকু আমার বাপের মুখে শুনতে পেয়েছি। খুঁটিয়ে বিচার করে ভগবানকে নিতে পারিনি, অত সূক্ষ্ম ধারণা করবার শক্তি আমার নেই আমি এইটুকু জানি, পায়ের তলায় মাটী তুলেই কুম্ভকার প্রতিমা গড়ে, —তাতে রং দেয় সে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সাধক। তার আবাহনে শিশুর হাতের পুতুলও হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত দেবতা—সে কথা তো মিথ্যে নয় ব্রজ। নির্দ্দিষ্ট একটা আধার তবু দরকার হয়, কেন না, হঠাৎ

মানুষ লাফিয়ে উপরে উঠতে পারবে না, তাকে উঠতে হয় সিঁড়ি ভেঙ্গে, —সেই জন্যে মন নিবিষ্ট করে রাখবার জন্যেই চাই কোন একটা মূর্ত্তি; চাই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে কুড়িয়ে আনতে বিশিষ্ট জাঁকজমক, পূজার বিরাট আয়োজন। মানুষের জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ লাভ হয়, তখন ছাড়া সে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে পায় না। এর নাম মনকে চোখ ঠারা নয় ব্রজ, মানুষের মনুষ্যত্বের সাধনা।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভগবান, দেবতা, ঈশ্বর এ সব মস্ত বড় কথা, গাল ভরে যায়, কিন্তু মন ভরে না, মা। আমার বিশ্বাস নেই, আমি মাটিকে মাটি, পাথরকে পাথর বলেই দেখেছি, মুর্ত্তির বৈশিষ্ঠ্য আমার চোখে পড়েনা; অপরূপ মুর্ত্তির সামনে জ্ঞানী মানুষকে মাথা নোয়াতে দেখলে আমার আজ কেবল হাসিই পায়। মানুষ এত সহজে নিজের স্বত্বা ভুলে যেতে পারে এ যেন আমি আজ ভাবতেই পারিনে। কি সার্থকতা আছে ওতে—অমনি করে মাথা পেতে দেওয়ার, তিল তিল করে নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করার?"

সুরমা উদার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি যে সার্থকতা আছে তা এই জ্ঞানী মানুষই অনেক সময় ভেবে পায়না ব্রজ। মানুষকে মূর্খ বলতে পার, তার জ্ঞানহীনতা নিয়ে পরিহাসও করতে পার, তবু জেনো—অত বড় নির্ব্বোধ আখ্যা নিয়েও মানুষ খুসি হয়ে থাকে—থাকতেও চায়। ওই যে তিল তিল করে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া, ওতেও মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। মানুষ ভাবে একেবারে যদি নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিতে পারত, তাতে তার সত্যিকার তৃপ্তি মিলতে পারত।"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল না।

*

*　　*

গ্রাম আর ভালো লাগিতেছিল না, কলিকাতায় যাইবার জন্য ব্রজেশ্বর অস্থির হইতেছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া এ কথা সে পিতাকে বলিতে পারিতেছিল না।

সেদিনে এই কথাটাই কোন রকমে পিতাকে বলিবার জন্য ব্রজেশ্বর পিতার নিকটে গিয়াছিল।

অবনী রায় তখন তাকিয়ায় ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছিলেন। পুত্রকে দেখিয়া গড়গড়াটা একপাশে সরাইয়া বলিলেন, "বসো,—এসেছ ভালোই হয়েছে। আমি তোমায় ডাকতে পাঠাবো ভাবছিলেম।" ব্রজেশ্বর আসিয়া অবধি পিতাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতেছে। কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত প্রজা নাকি খাজনা দেয় নাই, উপরন্তু সমস্ত প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করিবার যোগাড় করিতেছিল। দুর্দ্দান্ত জমিদার অবনী রায় সরকারের সাহায্য না লইয়া নিজেই তাহাদের শাসনের ভার লইয়াছিলেন। প্রজারা জমিদারের নামে নালিশ করিয়াছে, সত্যই শাসন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপে পাইয়াছে রুদ্রপুরের জমিদার জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে।

জমিদার নামটা আজও আছে, দেনার দায়ে সমস্ত জমিদারি বন্ধক পড়িয়াছে অবনী রায়েরই কাছে। প্রবল প্রতাপ চৌধুরীবংশকে এ বংশ দীর্ঘকালের মধ্যে স্ববশে আনিতে পারেন নাই, পারিয়াছেন অবনী রায়।

আজ জিতেন্দ্র চৌধুরীর কিছু নাই, তবু আছে 'সব ছিল' এই অহঙ্কার।

সংসারে থাকার মধ্যে আছে একটী মাত্র কন্যা পারমিতা।

সে পিতার কাছে থাকে খুব কম। ফোর্থ ইয়ারে সে পড়ে,

বোর্ডিংয়ে থাকে, বৎসরের মধ্যে ছুটির সময়টা আসিয়া পিতার কাছে কাটাইয়া যায়।

পিতার অতিরিক্ত পানাসক্তি এবং অতি দানশীলতাই যে আজ তাঁহাকে এই অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে জানে; একটা দিনও সে এজন্য অভিযোগ করে নাই, একটা দিনও জানিতে চাহে নাই কেমন করিয়া এত বড় সম্পত্তি রায়বংশের হাতে গিয়া পড়িল।

উপযুক্তা এবং শিক্ষিতা কন্যাকে পিতা এতটুকু সঙ্কোচ করিতেন, তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন, নিজে কোন কথা তাহাকে বলিতে পারেন নাই। মাস গেলে যেমন করিয়াই হোক—তাহার খরচ পাঠাইয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ও ঘন ঘন তামাক খান।

অবনী রায়ের কয়েকটী প্রজা যখন তাঁহার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল তখন আপনার কথা তাঁহার মনে পড়ে নাই। তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং নিজেই পুলিসে খবর দিয়াছিলেন।

পুলিসের হাঙ্গামায় অবনী রায়কে বড় কম ব্যস্ত হইতে হয় নাই, বাহিরের ব্যাপারে তাঁহাকে এত বেশী জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল যাহাতে বাড়ীর সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেই চলে।

কাল সদর কোর্টে মোকদ্দমার ভাব দেখিয়া আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য অবনী রায়কে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, এখনও হইতেছে, তাহাতে তাঁহার দুঃখ ছিল না; তিনি ঠিক করিয়াছেন এ যাত্রা রক্ষা পাইলে তিনি একবার জিতেন চৌধুরীকে দেখিয়া লইবেন।

মনের রাগ এখনও মনেই চাপা আছে, প্রকাশের ক্ষেত্র বা সময় এখনও আসে নাই।

পিতার কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একপাশে বসিল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া অবনী রায় বলিলেন, "চিরদিন যারা পায়ের নীচে ছিল, আজ তারাই কিনা মাথা ছাড়িয়ে মাথা তুলতে

চায়, এইটাই না বড় আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। এ যে রীতিমত বিপ্লবী কাণ্ড। একটা দিন ছিল, যেদিন ছোটলোক ছোটলোক হয়েই থাকত, ভদ্রলোকের সম্মান ছিল আলাদা জিনিষ। আজ কেমন করে যে সে সব উল্টে যাচ্ছে আমি তাই কেবল ভাবছি।”

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল, “রীতিমত রাশিয়া হয়ে উঠছে এ দেশ, বল্‌শেভিজম্ এখানেও চলছে।”

অবনী রায় একটান তামাক টানিয়া বলিলেন, “কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় রাশিয়া, সেই জন্যেই—তার ভাবধারা এ নিচ্ছে শুনলেই হাসি পায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা—সে আবার সবচেয়ে পরনির্ভরশীল দেশ, একেবারে অন্ধ, একেবারে বধির। সে রকম লিডার কোথায় যে এদের গড়বে, এই সব অন্ধকে চোখ দেবে, বধিরকে শ্রবণশক্তি দেবে? তুমি কি বলতে চাও, জিতেন চৌধুরীর মত লিডার এদের গড়বে, এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলবে? সত্যি এরকম শক্তিসম্পন্ন লিডার যদি এ দেশে জন্মাত, বাস্তবিক আমি তাতে আনন্দিত হতে পারতুম, উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পেতে পারতুম। কিন্তু এতো তা নয় ব্রজ, এদেশে তেমন সিংহ জন্মাবে না, জিতেন চৌধুরীর মত লোক লিডার হতে পারে না!”

ব্রজেশ্বর বলিল, “তুচ্ছ জিতেন চৌধুরীকে পায়ে দলতে কতক্ষণ দেরী লাগবে বাবা? ওর স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দেই, ওর সব কিছু তোমার হাতে থাকতে ও কিনা তোমার অনিষ্ট করতে সাহস পায়, তোমার নামে নালিশ করে?”

অবনী রায় বলিলেন, “তার সব আমার হাতে থাকার জন্যেই সে আমার শত্রুতা করছে এ কথা ঠিক। ওকে জব্দ করতে আমারও বড় বেশীক্ষণ লাগবে না ব্রজ, এতদিন জিতেন চৌধুরীকে উপেক্ষা করেই এসেছি, কিন্তু এর পর আর তাকে উপেক্ষা করা চলবে না। এর প্রতিশোধ আমি ঠিক নেবই, জিতেন চৌধুরী আমার হাত ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। ওকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করিনে, কিন্তু—এতটুকু গ্রাহ্য করি ওর মেয়েটাকে—”

"মেয়েটাকে—"

ব্রজেশ্বর হাসি চাপিতে পারে না।

মেয়েদের নাকি এতখানি শক্তি থাকিতে পারে যাহার জন্য তাদের গ্রাহ্য করিতে হইবে? জগতে কেবলমাত্র তাহার অস্তিত্ব থাকাটাই পর্য্যাপ্ত নয়, সে নাকি জোর করিয়া নিজের ক্ষমতা বজায় রাখিবে? দিন দিন মেয়েরা এতটা শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছে না কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, "যে দেশের মেয়েরা চিরকাল পায়ের তলায় ছিল, আজ তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে, আমাদের দমন করবে—শাসন করতে চাইবে, আমরা কি তাই সইব বাবা? সে পারমিতাই হোক আর প্রজ্ঞাই হোক, আমরা তাকে সামান্য একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনে বাবা।"

গম্ভীরমুখে অবনী রায় বলিলেন, "না না, তাকে সামান্য একটী মেয়ে বলে উড়িয়ে দিয়ো না ব্রজ, সে সত্যই অসামান্য মেয়ে—সে সব পারে। তুমি জানো না, সে জিতেন চৌধুরীর ডান হাত, যে কোন কাজ করে জিতেন চৌধুরী কখনও কারও কাছে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করে না, লজ্জাবোধ করে ওই মেয়েটার কাছে। সে মেয়ের শক্তি অসীম জিতেন চৌধুরী কেবলমাত্র তারই কথা শোনে।"

ব্রজেশ্বর মুখ বিকৃত করিল—

"কিন্তু সবাই তো জিতেন চৌধুরী নয় বাবা, নিজের সন্তানকে সবাই স্নেহ করে,—তাই বলে আর কেউ তো শুনবে না বাবা।"

অবনী রায় বলিলেন, "তুমি তাকে দেখনি, তার পরিচয় পাওনি, সেই জন্যই একথা বলতে পেরেছ। আগুনের ডেলা দেখেছ—যে সে ডেলা হাতে নেবে—তারই হাত পুড়ে যাবে; ও মেয়ে তাই,—সাধারণ যে কোন মেয়ে হতে সে পৃথক। তাকে যে একবার দেখবে, একবার যে তার কথা শুনবে, সে তার কথা ভুলতে পারবে না। হাঁ, লিডার যদি কেউ হয়—সে ওই মেয়ে,—ওই মেয়েই পারবে লিডার হতে। তুমি জানো ব্রজ, আমার বিদ্রোহী প্রজাদের জায়গা দিয়েছে সে আমায় দমন করতে তাদের উৎসাহিত করেছে সে—সেই পারমিতা।"

উত্তেজিতভাবে ব্রজেশ্বর দাঁড়াইল, বলিল, "বুঝেছি, সে তার এতটুকু শক্তি দিয়ে আপনাকেও অভিভূত করেছে বাবা,—তাই বলে আমায় পারবে না। যে মেয়েই হোক—তবু সে মেয়ে, যত শক্তিই থাক—পুরুষের শক্তির তুলনায় তা অতি দুর্ব্বল। হয় তো সে নিজেও নিজের দুর্ব্বলতা জানে, তবু সে আপনাদের উপরে তার শক্তি বিস্তৃত করতে পেরেছে—এতে জানা যায়—সে বোকা নয়—অতি চালাক। কিন্তু হোক সে চালাক, আপনি সব ভার আমার প'রে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, যা করবার তা আমিই করব।"

সে বাহির হইয়া গেল।—

*

* *

জিতেন চৌধুরীর বয়স হইয়াছে।

তথাপি মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সেই দেহ এতটা বিকল হইয়া যায় না, মাথার সমস্ত চুল এমন সাদা হইয়া যায় না।

লোকে বলে পান দোষে এমন হয়।

তাহাদের বক্র উক্তি জিতেন চৌধুরীর কাণে আসে, তিনি হাসেন মাত্র।

লোকে তাঁহার কথা কি বুঝিবে?

টাকা যদি থাকিত, তিনি দ্বিতীয় তাজমহল তৈয়ারী করিয়া জগতে পত্নী-প্রেমের আর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিতে পারিতেন।

মদ তিনি খান, সে কথা কোন দিনই তিনি অস্বীকার করেন না, তবু প্রমদা থাকিতে মাত্রাটা ছিল নিয়মিত, এতটুকু এদিক ওদিক হওয়ার যো ছিল না, স্ত্রী মারা যাইবার পর হইতে তাঁহার পানের মাত্রা বাড়িয়াছে।

তা বাড়ুক, তবু আজও তিনি সেই জিতেন চৌধুরীই আছেন, তাঁহার মধ্যে যে সরল, সহৃদয়, দানশীল হৃদয় ছিল, আজিকার এই দারুণ কষ্টেও সে মরে নাই—সে বর্ত্তমান আছে।

একদিন ছিল—যেদিন রায়বংশ ও চৌধুরীবংশ কোথাও গেলে সম্মান আগে জুটিত চৌধুরীবংশে। সেদিন রায়বংশকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া চৌধুরীবংশকে সম্মান দেখাইতে হইত,—কিন্তু আজ? আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

কালের চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে, তাই সেদিনকার রায়বংশ উঠিয়াছে উপরে আর চৌধুরীবংশ পড়িয়াছে নীচে। সেই রায়বংশ যে প্রণামী দিয়া চৌধুরীবংশের মান রাখিয়াছে, যে জমিদারি কিনিয়াও চৌধুরীবংশের বিনানুমতিতে জমিদার খেতাব লইতে পারে নাই, আজ সেই হইয়াছে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, আর তাহারই নিকটে বন্ধক পড়িয়াছে জিতেন চৌধুরীর জমিদারি।

সম্পদ বন্ধক পড়িলেও অন্তর বাঁধা পড়ে নাই, বৃত্তিগুলি আজও তাই উদার রহিয়া গিয়াছে। চৌধুরীদের জীর্ণ অট্টালিকার দরজা আজও সকলের জন্য উন্মুক্ত,—আজও কেহ প্রার্থীরূপে গিয়া রিক্ত হস্তে ফিরে না।

দানের পরিমাণ কমিয়া গেলেও আছে, যতদিন জিতেন চৌধুরীর দেহে প্রাণ থাকিবে, চেতনা থাকিবে, ততদিন নগদ টাকা নাই হোক, আসবাব পত্র দিয়াও তিনি দানের খেয়াল মিটাইবেন।—

অত্যাচারিত প্রজাদের আশ্রয় দিতে তিনি প্রথমটায় ভয় পাইয়া ছিলেন, কেননা এই ব্যাপার লইয়া জমিদারের সঙ্গে অনর্থক একটা বিবাদের সৃষ্টি হইবে।

পারমিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে তৎক্ষণাৎ প্রজাদের স্থান দিল, এবং জানাইল যদি দরকার হয় তাহাদের জন্য সে জমিদারের সহিত বিবাদ পর্য্যন্ত করিতে রাজি আছে।

জিতেন চৌধুরী ভারি আরাম পাইলেন। তাঁহার মন ঠিক এইটী করিতে চাহিলেও পারমিতার ভয়ে করিতে পারিতেছিলেন না, পাছে

সে কিছু বলে ;—পাছে সে বলে তাহার জন্য স্নেহময় পিতা কিছু রাখিয়া যান নাই কেবল শত্রু ছাড়া।

পারমিতা ছুটিতে যখন বাড়ী আসিত, পিতা তখন অনেক সংযত হইয়া চলিতেন, পানের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দানের মাত্রাও কমিয়া যাইত।

বাড়ী আসিয়া পলকের দৃষ্টিপাতে পারমিতা সকলই দেখিয়া লইত, বুঝিয়া ফেলিত। কোথায় কি থাকিত--সেখানে কি নাই কি আছে, ইহা ধরিতে তাহার বিলম্ব হইত না।

মুখে সে কিছু না জিজ্ঞাসা করিলেও পিতা বিব্রত হইয়া উঠিতেন, মনে হইত নীরবে এমনভাবে চোখ বুলাইয়া যাওয়ার চেয়ে প্রশ্ন করা অনেক ভালো। সে যে প্রশ্ন করে না, তিরস্কার করে না, পিতার নিকটে তাহাই দুর্ব্বহ শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

পারমিতা পিতার কোন কার্য্যে কোন দিন বাধা দেয় নাই,—তিনি নিজের খুসি মত যাহা করিয়া যান,—তাঁহার ব্যর্থ জীবনটায় এমনই--ভাবে যদি এতটুকু শান্তি মিলে, তাহাতেই তিনি শান্তি পান।—

সে তো জানে তাহার মাতৃবিয়োগ তাহার বুকে যতটা বাজিয়াছে, পিতার বক্ষে তাহার চেয়ে বড় কম বাজে নাই। আজ যদি তিনি এই সব লইয়া ভুলিয়া থাকিতে চান, তাহাই করুন, পারমিতা বাধা দিবে না।

স্ত্রী স্বামীর যৌবনের সহধর্ম্মিনীই ছিলেন না, বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গিনীও ছিলেন। একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়ী, এতটুকু বয়স হইতে পরস্পরের সহিত জানাশোনা ছিল, বিবাহও হইয়াছিল বাল্য বয়সে। তখন স্বামীর বয়স মাত্র দশ এবং স্ত্রীর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র।

সেই স্ত্রী বিয়োগে মানুষ পাগল হইয়া যায়, আত্মহত্যা করে। পারমিতার পিতা যদি লোক লইয়া—তাহাদের খাওয়াইয়া জিনিষপত্র দিয়া আনন্দ লাভ করিতে চান তাহাই করুন।

সব গিয়াছে ; অর্থ সম্পদ গিয়াছে, স্ত্রী গিয়াছে, তথাপি আজও জিতেন চৌধুরী হো হো করিয়া হাসেন, আজও দাবা খেলেন,—আজও লোকের সঙ্গে মিশেন।

পিতাকে পারমিতা ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, তাঁহাকে ভালোবাসে ;—শিশুর মত শাসন করে। বাড়ীতে সে যতদিন থাকে পিতাকে নিয়মিত স্নানাহার করিতে বাধ্য করায়, পড়িতে গিয়াও সে শান্তি পায় না, পুরাতন ভৃত্য ভোলা-দার নামে সপ্তাহে দু' তিনখানি করিয়া পত্র আসে পিতা নিয়মমত চলেন কি না।

বাধ্য হইয়াই জিতেন চৌধুরীকে নিয়মে চলিতে হয়। স্ত্রী যাহা পারেন নাই, পিতামাতার শাসনে যাহা সম্ভব হয় নাই, কন্যার পত্রে তাহাও সম্ভব হয়।

পারমিতা পিতাকে যতখানি শ্রদ্ধা করে, অত্যাচারী জমিদার অবনী রায়কে ঠিক ততখানি ঘৃণা করে।

অত বড় জমিদারি নিজের কাছে বন্ধক রাখার মধ্যে যে কতখানি ছলনা ও চাতুরী আছে তাহা সে জানে—ভোলা জানে সামান্য টাকা ধার দিয়া অনেক টাকা লিখাইয়া লওয়া চলে, জিতেন চৌধুরীর মত লোককে দিয়াই—আর কাহাকেও দিয়া নয়।

একবার মাত্র কন্যা প্রশ্ন করিয়াছিল—"তুমি হ্যাণ্ডনোট লিখে কেন টাকা নাও বাবা, জমিদারি বাঁধাই বা দাও কেন, তার চেয়ে কিছু বিক্রি করে দাও না কেন?"

পিতা কেবল মাথা চুলকাইয়া হাসিয়াছিলেন শেষে বলিয়াছিলেন "তুই যে জন্যে এ কথা বলছিস মিতা, সে ভয় নেই। অবনী রায় আমার বন্ধু, যদিও তারা একদিন বংশমর্য্যাদায় আমাদের সমান সম্মান পায়নি, তবু যখন তার সঙ্গে একদিন পড়েছি—তখন সে আমার বন্ধু ছাড়া কিছু নয়। সে আমার অত বড় সর্ব্বনাশ করতে পারবে না তুই বরং দেখে নিস মিতা।"

দু' তিন বৎসর না যাইতেই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, জিতেন চৌধুরী সেদিন হইতে পারমিতার সহিত ভালো করিয়া কথা বলিতে পারেন না।

অবনী রায়ের মত খল, পরশ্রীকাতর লোককে পারমিতা সহ্য করিতে পারে না। তাঁহাকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিবার জন্যই সে

অত্যাচারিত প্রজাদের স্থান দিয়াছিল এবং তাহাদের দিয়া মোকদ্দমাও আনিয়াছিল।

অবনী রায় পারমিতাকে বেশ চেনেন, তাহার বুদ্ধির জ্ঞানের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন।

এমনই একটী মেয়েকে পুত্রবধূরূপে নিজের অন্তঃপুরে পাইবার কামনাও বুঝি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে কামনা যে কোনদিনই সফল হইবে না তাহা তিনি না জানিতেন তাহা নহে। ছলনা, চাতুরী, জুয়াচুরি দ্বারা সম্পত্তি হস্তগত করা চলে, বংশমর্যাদা ধ্বংস করিতে পারা যায় না; বিশেষ পারমিতার ন্যায় বিদূষী কন্যা—ও মেয়ের হাতে সাম্রাজ্য পড়িলে সে অবলীলাক্রমে শাসন করিতে পারে।

সত্যই পারমিতাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, সঙ্কোচ জাগে ওই মেয়েটীর চোখের সামনে পড়িলে! পারমিতা যে ঘৃণা করিয়াই তাঁহাকে এড়াইয়া যায়, সে ঘৃণা তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই মানিয়া লন।

ব্রজেশ্বর বাহিরের এত খবর পায় নাই। বাল্যে সে এখানে থাকিত, অন্তঃপুরের অজ্ঞতায় তখন সে ছোট, পারমিতাও ছোট। দু' একদিন পিতার সহিত নন্দনপুরে গিয়া ফ্রগ-পরা ছোট মেয়েটীকে দেখিলেও তাহার কথা আজ মনে নাই।

দেশ ছাড়িয়া সে যখন গিয়াছিল তখন পারমিতার বয়স হয়তো এগার বার; আজ তাহার বয়স উনিশ কুড়ি। সেদিনকার শোনা পারমিতা নামটাই আজ সে ভুলিয়া গিয়াছে।

*

*   *

খোলা ছাদের উপর রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল পারমিতা—

সূর্য্য তখন ডুবিয়া গেলেও আকাশের পশ্চিম দিকে এখন লাল রং অনেকটা জমিয়া আছে, সেই লাল রংয়ের আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল পূর্ব্বদিকে। পূর্ব্ব আকাশে শুক্লা-পঞ্চমীর চাঁদখানা বাঁকা ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল, এখনও তাহার আলো উজ্জ্বল হইয়া ফুটিতে পায় নাই।

অট্টালিকার ওধারে দেখা যায় সবুজ ধানের ক্ষেত, সোনার বরণ ধানে সে ক্ষেত ভরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা-বাতাস বহুদূর হইতে বহিয়া আসিয়া ধান ক্ষেতের উপর দোলা দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কবির গান এখানে প্রাণবন্ত হইয়াছে, কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চেনা অচেনা কত পাখী সেই ধান ক্ষেতের উপর দিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে, আকাশতল তাহাদের বিচিত্র গানের সুরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

পারমিতা রেলিংয়ে ভর দিয়া তাকাইয়াছিল দূরের পানে। আকাশের অনুপমের রূপ সে দেখিতেছিল না, মাঠের অনন্ত সৌন্দর্য্য সে দেখে নাই, পাখীর গানও শুনে নাই; মাঠ যেখানে ফুরাইয়া গেছে, সেখানে আরম্ভ হইয়াছে কৃষকের কুটীরশ্রেণী, পারমিতা তাকাইয়াছিল তাহারই পানে।

আজ বিচারের শেষ দিন,—

পিতা এখনও সদর হইতে ফিরেন নাই, ফিরিতে রাত্রি হইবে। সে যেমন উদ্বেগ-ব্যাকুল নেত্রে পথের পানে তাকাইয়া আছে, ওই সব কুটিরে কৃষক-বধূ, কৃষক-কন্যারাও তেমনই উদ্বেগ ব্যাকুল নেত্রে পথের পানে তাকাইয়া আছে।

আজকার মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইলেও পারমিতার ক্ষতি হইবে না, ক্ষতি হইবে উহাদের, ওই সব দরিদ্রেরা ধনে প্রাণে মরিবে।

ভগবান ধনীর—এই কথাই কি সত্য, দরিদ্রের কেহ নাই—কিছুই নাই ? তাহারা অত্যাচার সহিবে; পীড়ন সহিবে, প্রতিবিধান করিবার উপায় থাকিলেও তাহারা করিতে পারিবে না—যেহেতু তাহাদের অর্থ নাই।

জগতে অর্থই সব—মনুষ্যত্ব কিছু নয় ?

পারমিতা অধর দংশন করিল—

নয়ই তো,—মনুষ্যত্বের সম্মান এখানে দেয় কে ? জগৎ সত্যই অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাই না এই দরিদ্র প্রজারা সহিতেছে পীড়ন, হয় তো জেলেও যাইবে।

অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘনাইয়া আসিল—আকাশে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তারাগুলি এদিক ওদিক ছড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল। অল্প অল্প শীত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

পিছন হইতে দাসী ডাকিল, "বড় ঠাণ্ডা পড়ছে দিদিমণি, ঘরে আসুন।"

পারমিতা পিছন ফিরিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ফিরেছেন ?"

সে উত্তর দিল, "এখনও আসেন নি, এখনই ফিরবেন।"

কতখানি উদ্বেগ জাগিতেছে।

ভোলা চুপচাপ বারান্দায় বসিয়াছিল। সে আগেই বলিয়াছিল—"কাজ নেই বাবু ওদের দিয়ে নালিশ করিয়ে,—পরের ঝক্কি মাথায় নেওয়ার দরকার কি। এরই নাম খাল কেটে কুমীর আনা। ওরা সয়তান বাবু, অবনী রায় সব করতে পারে,—কি দরকার তাকে ঘেঁটিয়ে ?"

পারমিতা ডাকিল—"ভোলা-দা—"

ভোলা উত্তর দিল না।

অন্তর যদিও উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি পারমিতা

হাসিয়া বলিল, "ভোলা-দা একেবারে তিন হাঁটু এক করে বসেছ। আচ্ছা ভোলা-দা, ব্যাপারখানা কি বল তো, অমন করে বসে থাকলেই কি সব হবে—?"

ভোলা মাথা তুলাইল—হতাশ ভাবে বলিল, "বাবু না ফেরা পর্য্যন্ত শান্তি পাচ্ছিনে দিদিমণি, মন ভারি খারাপ লাগছে।"

পারমিতা বলিল, "যত সব উদ্ভট ধারণা তোমার ভোলা-দা।—বাবা কতদিন তো অনেক রাত্রেও ফিরে আসেন, কই তখন তো এমন ভাবনা তোমার হয় না।"

ভোলা বলিল, "হয় না—আজ হচ্ছে তার কারণ আজ শেষদিন কি না। বাবু বলেছিলেন মোকর্দ্দমার অবস্থা ভালো নয়, ওরা অনেক সাক্ষী যোগাড় করেছে, টাকা আছে, এক ঢিলে দুই পাখী মারবে। কি যে ব্যাপারটা হবে তাই বুঝতে পারছিনে।"

সে উঠিল না, যেমন বসেছিল তেমনই বসিয়া রহিল।

রাত্রি নিঃশব্দে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—ঘরের পাশে আম গাছের ডালে রাত্রিচর কি একটা পাখী অতি কাতর সুরে ডাকিতেছিল।

অল্প একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভোলার ডাকে সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পারমিতা জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভোলা-দা—বাবা এসেছেন?"

ভোলা উত্তর দিল, "খানিকক্ষণ আগে ফিরেছেন, আপনাকে ডাকছেন।"

তখন চাঁদ অস্তাচলে গিয়াছে,—অন্ধকার পৃথিবীর বুকে বেশ জমাট ভাবে নামিয়া আসিয়াছে।

জিতেন চৌধুরী নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, পাশেই গড়গড়ায় তামাক পুড়িয়া ছাই হইতেছিল—সেদিকে তাঁর লক্ষ্যও ছিল না।

পারমিতা প্রবেশ করিতে তিনি একবার চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে তাকাইলেন মাত্র, একটী কথাও বলিলেন না।

পারমিতা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া নিঃশব্দে মাথায় হাত দিল—

"এ কি বাবা তোমার জ্বর হয়েছে ?"

জিতেন চৌধুরী একটু হাসিয়া তাহার হাতখানা কেবল চোখের উপব চাপিয়া ধরিলেন।

শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কই জিজ্ঞাসা করলিনে মিতা মোকর্দ্দমার কি ফল হল ?"

পারমিতা বলিল, "সে তো বুঝেছি বাবা, এরা হেরে গেছে, অবনী রায় জিতেছে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিতেন চৌধুরী বলিলেন. "সত্যিই তাই মিতা। এখন এ বেচারাদের অবস্থা একবার মনে কর, অবনী রায় ওদের নামে নালিশ এনেছে, এরা একেবারেই ডুবল।"

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

পারমিতা বলিল, "আমিও ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলেম বাবা, ভোলাও ঠিক এই কথাই বলেছিল। তোমাকেও তো কম পীড়ন সইতে হবে না বাবা,—অবনী রায় তোমাকেও তো ছাড়বে না।"

জিতেন চৌধুরী শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা আমিও জানি পারমিতা ; আমায় অনেকই সইতে হবে কিন্তু সেজন্য আমিও প্রস্তুত হয়ে রয়েছি।"

পাবমিতা পিতার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "থাক বাবা, কাল এসব হবে, আজ তুমি চুপ করে ঘুমাও। একটু দুধ এনে দেব বাবা, সেই তো সকাল আটটার সময় খেয়ে গিয়েছিলে, আব তো কিছু খাওনি।"

মাথা নাড়িয়া জিতেন চৌধুবী বলিলেন, "না মা, থাক, খেতে ইচ্ছে নেই।"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সব গিয়ে আজও তবু আমি দুধ খেতে পাই মিতু, কিন্তু ওরা হয়তো একমুঠো ভাতও খেতে পাচ্ছে না, আজ ছেলেপুলে নিয়ে উপবাস করে পড়ে আছে।"

উত্তেজিতকণ্ঠে পারমিতা বলিল, "অপরাধ ওরা গরীব,—এ দুঃখ

যে এদের সইতেই হবে বাবা। আমরাও দরিদ্র, তাই আগতপ্রায় ভবিষ্যতের জন্যে আমাদেরও প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে, সেদিনে আমাদেরও পেটে জ্বলবে দারুণ ক্ষুধার আগুন, অথচ আমরা খেতে পাব না। না বাবা, দরিদ্রের প্রতি ধনীর ঔদাসীন্য; কঠোর অবজ্ঞা সওয়া যায় না। আমি দরিদ্রকে জাগিয়ে দেব, ওদের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেব। ওরা যখন জানবে দারিদ্র্য সত্য অহঙ্কারের জিনিষ তখন ওরা এমন দীনভাবে পায়ের তলায় পড়ে থাকতে চাইবে না, নিজেদের স্পর্দ্ধা নিয়ে নিজেরাই উচু হবে।"

তাহার হাত দু'খানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিতেন চৌধুরী বলিলেন, "ও কাজ করো না মা, কেউ তোমায় চিনবে না—তোমার কাজ দেখবে সন্দেহের চোখে—তোমায় ফেলবে বিপদে। দারিদ্র্য দরিদ্রের কাছে চিরদিনই হোক না অহঙ্কারের বস্তু, ধনী যতদিন বর্ত্তমান থাকবে—একে দারুণ অবহেলার চোখেই দেখবে—যেমন আজও দেখছে।"

পারমিতা বলিল, "সেই জন্যেই তো ধনী অভিজাত বংশের ধ্বংস চাই বাবা, যেমন আজকাল হচ্ছে। কেউ বা মোটর হাঁকিয়ে সগর্ব্বে চলে যাবে, আর কেউ বা কাপড়ে কাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বা সেই চাকার তলায় প্রাণ দেবে। এ বৈষম্য দেশের বুক হতে মুছে দিক এই দরিদ্র অত্যাচারীতেরা,—সকলকে সমান করে নিক যদি তার শক্তি থাকে।"

"পাগ্‌লী—"

"পিতার মুখে ফুটে ওঠে শান্ত এক টুক্‌রা হাসির রেখা মাত্র।"

"আজ আর কথা বলতে পারছিনে মিতা, সারাদিন অবিশ্রান্ত কথা বলে শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজ কিছু খেতেও পারব না, আমায় এখন খানিকক্ষণ ঘুমাতে দে। কাল সকালে ওদের ডাকব, ওদের নিয়ে আর একবার চেষ্টা দেখব—যদি পারি দাঁড়াব—বাঁচব, না পারি মরব এই আমার প্রতিজ্ঞা, জিতেন চৌধুরীর প্রতিজ্ঞা—হয় জীবন, নয় মরণ, একবার দেখে নেব, এত সহজে যেতে দেব না।"

*

*　　*

কি একটা কাজে ব্রজেশ্বর বাহির হইয়া গিয়াছিল। সুরমা তাহার কাছেই আসিয়াছিলেন, দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন।

পাশের ঘরে অবনী রায় কি করিতেছিলেম, তাঁহার সাড়া পাইয়া সুরমা থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

একবার চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল, পরক্ষণেই মনে হইল—চলিয়া গেলে হইবে না, তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছেন তাহা করিতে হইবে।

সুরমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অবনী রায় চোখ তুলিয়া বিস্মিত ভাবে তাঁহার পানে তাকাইলেন।

আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে। সুরমা কখনও এমন করিয়া অনাহুত ভাবে আসিয়া দাঁড়ান নাই, বরাবর তাঁহাকে ডাকিতে হয় তবে তিনি আসেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দরকার আছে সুরমা?"

সুরমা কেবলমাত্র উত্তর দিলেন, "আছে।"

"কি,—ব্রজেশ্বর সম্বন্ধে—?"

অবনী রায় জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার পানে তাকাইলেন।

সুরমা উত্তর দিলেন, "না তার সম্বন্ধে নয়।"

আশ্বস্ত হইয়া অবনী রায় বলিলেন, "তবে কি,—সংসার সম্বন্ধে?"

সুরমা বলিলেন, "না, সংসার সম্বন্ধেও কোন কথা তোমায় বলতে আসিনি, বলতে এসেছি জিতেন চৌধুরীর সম্বন্ধে আর গরীব প্রজাদের সম্বন্ধে—"

অবনী রায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন—

"বটে, জিতেন চৌধুরী আর প্রজাদের সম্বন্ধে তুমি কথা বলতে

চাও ? তাদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে, তাদের উৎপীড়ন করা হচ্ছে—এই কথাই বলবে তো সুরমা—অর্থাৎ তাদের দিক টেনে কথা বলবে তা আমি জানি। দরিদ্র দুস্থ দেখলে—কারও কষ্টের কথা শুনলে তোমার প্রাণ কাঁদে সে কথা আমার বেশই জানা আছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তরটা আগে দিয়ো সুরমা ওরা যখন তোমার স্বামীকে বিব্রত করে তুলেছিল হয়তো তাকে জেলে যেতে হতো—ঘানি টানতে হতো, তখন তোমার স্বামীর বিপদের পরিমাণ এতটুকুও কি ভেবেছিলে সুরমা ?

সুরমা নিঃশব্দে কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

অবনী রায় বলিলেন, "অবশ্য তাদের সে মোকর্দ্দমা ফেঁসে গেছে, আমায় আর পুলিসকে অনর্থক হায়রাণ করার জন্যেই ওরা আজ অভিযুক্ত হয়েছে। আমি ওদের উপযুক্ত শাস্তি দেব সুরমা, জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাজা ওরা আমার কাছ হতেই পাবে। আমি অবনী রায়, আর যে কেউ হলেও সব ছেড়ে দিত, কিন্তু আমি ছাড়ব না সুরমা, আমি ওদের জানিয়ে দেব, জমিদার আর মহাজনের বিপক্ষে দাঁড়াতে ওদের আর কতখানি শক্তি থাকা দরকার তবে ওরা দাঁড়াতে পারবে, তবে বিপক্ষতা-চরণ করতে পারবে। এ প্রতিশোধ আমি নেবই সুরমা, তোমার অনুনয় বিনয়ে আমি ওদের ছাড়ব না।"

সুরমা মুখ তুলিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু ওরা তো আগেই তোমার বিরুদ্ধাতাচরণ করতে যায়নি,—

অবনী রায় দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "যায়নি কি রকম ? মনে কর সুরমা—খাজনা চাইতে গিয়ে আমার নায়েব গোমস্তা ওদের কাছ হতে কি রকম অপমান পেয়েছে ? ওরা সেদিন স্পষ্ট বলেছে—ওরা খাজনা দেবে চৌধুরীবংশকে। তারা চৌধুরীবংশের প্রজা, রায়বংশের প্রজা তারা নয় বলেই খাজনা দেবে না। সে অপমান নায়েব গোমস্তার নয় সুরমা, সে অপমান আমার, সে অপমান অবনী রায়ের। তারা স্পষ্ট বলেছে আমি নাকি জুয়াচুরি করে জিতেন চৌধুরীর সম্পত্তি নিয়েছি সেই জন্যেই তারা তাকে ছাড়া আর কাউকে ভূস্বামী বলে মানতে রাজী

নয়। তাই তো আজ আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছি সুরমা, এ অপমানের শোধ নেব, জিতেন চৌধুরীকে পথে বসাব, প্রজাদের বিষ দাঁত ভাঙ্গব, তবে আমার নাম অবনী রায়।"

সুরমা তাঁহার চোখে যে আগুন জ্বলিতে দেখিলেন সে আগুন পৃথিবীর নয়।

সুরমা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সব বুঝেছি, তবুও একটা কথা বলি—তারা যে তোমায় জমিদার বলে মানতে চায়নি, খাজনা তোমায় দিতে চায়নি—সেটা কি তাদের অন্যায় হয়েছে? এই জমিদারি—এ-কি সত্যিই—"

"সুরমা—"

পুচ্ছমর্দ্দিত ব্যাঘ্রের মতন অবনী রায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, সে গর্জ্জনে সুরমা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন।—

অবনী রায় পরমুহূর্ত্তে সংযত হইয়া গেলেন,—শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি মেয়েমানুষ, এ সব কিছু বুঝবে না—যাও, নিজের কাজ কর গিয়ে।"

ব্যস, এই কথাটিই যথেষ্ট,—মেয়ে তিনি, কোন কিছু বুঝেন না, কাজেই কোন কিছুতেই তাঁহার অধিকার নাই,—তিনি সকলের বাহিরে—তিনি সকলের অতীত।

সুরমা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন।

সূর্য্যের আলো কালো মেঘের তলায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে,—সমস্ত গ্রাম ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছে। কালো মেঘের তলা দিয়া কত পাখী কত বক উড়িয়া চলিয়াছে—কোন্ দূরের পানে লক্ষ্য করিয়া কে জানে।

সুরমা আসিয়া দাঁড়াইলেন ছাদের প্রান্ত সীমায়,—

অনন্ত আকাশ, অগণিত পাখী উড়িয়া চলিয়াছে, উহারা সকলেই স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীন নয়। অধীন কেবল মানুষ, ইচ্ছা হইলেও মানুষের স্বাধীনতা লাভের উপায় নাই।—

ছোট্টবেলায় পড়া একটা কবিতার কথা মনে পড়ে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?"

কবি আস্ফালন করিয়াছেন মিথ্যা, স্বাধীনতা হীনতায় মানুষই বাঁচিয়া থাকে, পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও তাহারা মরে না।—

তবু এখনও আশা আছে—

উপযুক্ত পুত্রের উপর সমস্ত ভার দিয়া অবনী রায় নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছেন। সে পুত্র সুরমারও তো বটে, সুরমার কথা সে কি রাখিবে না—মাকে সে অপমান করিতে পারিবে কি ?

আজই সকালে মতির স্ত্রী চার পাঁচটী শিশু সন্তান লইয়া আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। অন্তঃপুরের বাহিরে যে বিশাল জগৎ আছে সে জগতের বার্ত্তা পাইলেও সেখানে যে এত অত্যাচার অবিচার চলে, ধনী ধনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া দরিদ্রকে এমন করিয়া নিপীড়ন করে, সে বার্ত্তা সুরমার কানে পৌঁছায় নাই।

আজই প্রথম তিনি জানিয়াছেন—বাহিরে কত অত্যাচার চলে, কত চোখের জল পড়ে। মতিব স্ত্রী যখন অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল তখন সুরমা চোখের জল সামলাইতে পারেন নাই।

হতভাগ্য জিতেন চৌধুরী—

বধূরূপে যখন সুরমা এ সংসারে আসিয়াছিলেন তখন অবনী রায় ষোল আনা জমিদার হইতে পারেন নাই—তখনও জিতেন চৌধুরীর আসন ছিল অনেক উপরে। তাঁহার বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সুরমাকে যাইতে হইয়াছে, জিতেন চৌধুরীর পরিবারের মহিলা কেহ এ বাড়ীতে আসেন নাই।

দেবতুল্য এই লোকটির কথা সুরমা অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছেন; সামনে কোনদিন তাঁহাকে না দেখিলেও সুরমা তাঁহাকে ভক্তি করেন, শ্রদ্ধা করেন।

সেই লোকের আজ এই দুর্দ্দশা—আর সেই দুর্দ্দশার কারণ তাঁহারই স্বামী; বন্ধুত্বের ছলনায় সেই নিরীহ লোকটীর সর্ব্বনাশ তাঁহার স্বামীই করিয়াছেন—

এ কলঙ্ক যেন মুছিবার নয়, এ গ্লানি যেন ঘুচিবার নয়।

এই যে জমাট কালি, এ কালি ঘসিয়া মাজিয়া তুলিবার ক্ষমতা

কি সুরমার আছে? তিনি জানেন নাই,—তাঁহার সে শক্তি নাই—সাহস নাই, তথাপি যখন মতির স্ত্রী তাঁহার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া বলিল, "তুমিই পারবে মা আমাদের বাঁচাতে —আমাদের কর্ত্তা মশাইকে বাঁচাতে তুমিই পারবে, আর কেউই পারবে না। তখন যেন তাঁহার মনে এতটুকু শক্তি, এতটুকু সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল, আত্মবিশ্বাসও জন্মিয়াছিল।

সেই সাহস ও শক্তি লইয়াই তিনি আজ স্বামীর সামনে না ডাকিতে গিয়াছেন, মুখ ফুটিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন; উত্তর শুনিয়াছেন—তিনি মেয়ে; এ সব কিছু বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

নাই—সে কথা তিনিও অস্বীকার করেন না, কিন্তু লোকের অবস্থা বুঝিবার শক্তিও কি তাঁহার নাই? সমবেদনা প্রকাশ করিবার, কাহারও দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করারও কি তাঁহার অধিকার নাই?

দিনের পর দিন মুখ বুঝিয়া এই মানুষটী যে কত দুঃখ বেদনা সহিয়া থাকেন—সে কথা তো কেহই জানে না, তিনি তো কাহাকেও জানান নাই। সব দিয়াও তিনি হাসেন, অন্তরে রোদন উচ্ছ্বসিয়া উঠে, হাসি-আবরণ টানিয়া তিনি নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যান।—

পরম সহ্যশীলা ধরিত্রীও চঞ্চল হইয়া উঠে—সে কখন? যখন বুকের উপরকার ভার হইয়া উঠে ধারণের অতীত, ব্যথা যখন নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাপাইয়া যায় অশ্রু সাগরে বাণ ডাকে—তখনই নয় কি?

*

*　　*

বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ব্রজেশ্বর শিয়রের খোলা জানালাপথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

অন্ধকার—নিবিড় নিকষকালো অন্ধকার গায়ে গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া, মাঝে মাঝে জোনাকির আলো দেখা যায়; আকাশের বুক নিরন্ধ্র মেঘে ছাইয়া গিয়াছে; তাহারই ওপারে অসংখ্য তারা নিত্যকার মত আজও ফুটিয়াছে, মেঘের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া তাহার আলো এপারে পৃথিবীর বুকে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই।

খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বেশ বেশী রকম শীত পড়িয়াছে, ব্রজেশ্বর জানালা বন্ধ করে নাই, ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না।

অনেক দূরে কোনও কৃষকের কুটিরে বাঁশী বাজিতেছিল, নিস্তব্ধ রাত্রে সে বাঁশীর সুর শুনাইতেছিল অতি চমৎকার।—

পিছনে ভেজান দরজা ঠেলিয়া কে যেন প্রবেশ করিল—ব্রজেশ্বর মুখ ফিরাইল না।

"একি ব্রজ, এই ঠাণ্ডায় জান্‌লা খুলে দিয়েছিস, শীতও লাগছে না—আশ্চর্য্য।"

সুরমা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বৃষ্টির পর বাতাস—এই শীতের রাত্রে ভালোও কি লাগছে?"

ব্রজেশ্বর একটু হাসিয়া শ্রান্তভাবে ভালো করিয়া শুইয়া বলিল, নেহাৎ মন্দ লাগছিল না মা। জান্‌লা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল বটে, তবু জান্‌লার বাইরে অনেক সুন্দর জিনিস দেখতেও পাচ্ছিলেম। কি সুন্দর অন্ধকার দেখছিলেম—পৃথিবী আর আর আকাশের মাঝখানে

যে অসীম অনন্ত ব্যবধান আছে, তার নাম শূন্য—সে কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেম।"

সুরমা ফিরিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন, "শরীর তা তো ভুলবে না ব্রজ, সে ঠিক অসুস্থ হবেই।"

ব্রজেশ্বর মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া বলিল, আমার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না মা, মাথাটা আমার বেজায় ভার বোধ হয়েছে।"

পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরমা তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "সব লোকে তোকে পাগলই বলবে ব্রজ, এই ঠাণ্ডায় লোকে যেখানে বরফ হয়ে যায়, সেখানে তুই দিব্য করে জান্‌লা খুলে শুয়ে পড়েছিলি।"

ব্রজেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার জন্যেই তো রেখেছিলেম মা, তুমি আসবে—জানালা বন্ধ করবে সেই জন্যেই তো।"

সুরমা বলিলেন, "পাগল আর কি, যদি না আসতেম তাহলে জানালা অমনি খোলাই থাকতো তো—?"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল—"তা থাকতো।"

সে চুপ করিয়া রহিল,—সুরমাও চুপ করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।—

ক্লক ঘড়িটায় টং টং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "শুতে যাও মা, অনেক রাত হয়ে গেল। তুমি আবার যে ভোরে ওঠ, এখন শুয়ে পড়াই ভালো।"

অত্যন্ত শ্রান্তকণ্ঠে সুরমা বলিলেন, "যাচ্ছি ব্রজ—"

একটা কথা তিনি বলিতে চান, কিন্তু সে কথা কণ্ঠে আসে, মুখে ফুটিতে চায় না, সঙ্কোচে মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

এত সঙ্কোচ---পুত্রের কাছে? এ সেই পুত্র যে তাঁহার কোলে আজিকার মত মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইত। সেদিন সে ছিল তাঁহার—একান্ত তাঁহার। আর আজ—?

আজ তিনি জানেন সে তাঁহার নহে, সে তাঁহার স্বামীর বংশধর, বংশের ধারা তাহাকেই রক্ষা করিতে হইবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "তোকে আজ একটা কথা বলতে এসেছি ব্রজ—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা লক্ষ্য করিয়া ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা মা ?"

সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সুরমা বলিলেন, "বলছি প্রজাদের কথা, জিতেন চৌধুরীর কথা—"

আস্তে আস্তে ব্রজেশ্বর বলিল, "তা আমিও বুঝেছি মা, বিনা স্বার্থে তুমি আমার ঘরে এসোনি, আমার সম্বন্ধে এত সতর্কতা নাওনি।"

মর্ম্মপীড়িতা সুরমা বলিয়া উঠিলেন, "তুইও এ কথা বললি ব্রজ, তুইও আমায় এত স্বার্থপর ভাবিস ?"

ব্রজেশ্বর মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল—

"তোমার কাজে তাই তো মনে হয় মা, এই যে দু' তিন মাস এসেছি, কোনদিনই তোমায় ধরতে পারিনি মা, যতবার ধরতে গেছি— তুমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছ, তোমায় ধরবার চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে। তা হোক—আমি সেই উপেক্ষার মধ্যেই মানুষ চিনতে পেরেছি মা, আমি দাঁড়াতে পেরেছি। প্রথমটায় বড় আঘাত লাগলেও ভেঙ্গে পড়িনি, আমি মাথা তুলেই আছি, দাঁড়িয়েও থাকব। সত্যি ভাব দেখি মা, তুমি আমার সঙ্গে কোনদিন ভালো ব্যবহার করেছ কি ? কতদিন ভালো করে খাইনি, স্নান করিনি, রাত্রে ঘুমাইনি কোনদিন দেখেছ কি মা ?"

ধীর কণ্ঠে সুরমা উত্তর দিলেন,—"না। কেন তোকে এড়িয়ে গেছি সে কথা আমি তোকে বলতে পারব না বাবা,—একদিন তুই শুনতেই পাবি। কেবল এটুকু জেনে রাখ—তোর ভবিষ্যতের পানে চেয়ে তোর মঙ্গল ইচ্ছাতেই আমি তোকে এড়িয়ে চলেছি।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "চুলোয় যাক ভবিষ্যৎ, অধঃপাতে যাক মঙ্গল, তোমায় হারিয়ে মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ আমি চাইনে মা, আমার বর্ত্তমানই যে ভালো ছিল। কে চেয়েছিল তা—কেন সে ভবিষ্যতের জন্যে তুমিই বা তোমার সুন্দর বর্ত্তমান ধ্বংস করলে মা ?"

সুরমার চোখ হইতেই নিশ্চয় দুই ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া ব্রজেশ্বরের মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সুন্দর বর্ত্তমান,—হাঁ, সে সুন্দরই ছিল, অতি সুন্দর ছিল। সে বর্ত্তমান আজ মিলাইয়া গেছে, দূর অতীতের বুকে। বংশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য মা তাঁহার সন্তানকে ত্যাগ করিয়াছেন, কুললক্ষ্মীর মর্য্যাদা তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে, সে কর্ত্তব্য তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে।

ব্রজেশ্বর মায়ের পানে তাকাইল।

পিছনে আলো—সামনে আব্‌ঝা অন্ধকার, মায়ের সামনের দিকটা ছায়ার মত মনে হয়, চোখ স্পষ্ট দেখা যায় না।

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব।

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বলতে চাও তা তো কিছু বললে না মা।"

একটা হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরমা বলিলেন, "বলছিলেম ওদেরই সম্বন্ধে ব্রজ। ওঁর কাছে বলতে গিয়েছিলেম, উনি স্পষ্টই বললেন—আমি নাকি কিছু বুঝিনে। আজ তুইও কি সেই কথা বলবি ব্রজ, ওঁর মত করে আমাকেও বলবি—আমি কিছু বুঝিনে?"

ব্রজেনর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর ধীর কণ্ঠে বলিল, "অত বড় কথা তোমাকে বলবার ক্ষমতা আমার নেই মা। বাবা বলতে পেরেছেন তুমি তাঁর স্ত্রী—কেবল সেই দাবীতে; আমি তোমায় বলতে পারিনে কারণ তুমি আমার মা, আমার কাছে স্বর্গ হতেও মহান্—উচু। আমায় মাপ করো মা, তোমায় কত সময় কত রূঢ় কথাই বলেছি—তোমার মনে কত সময় জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ব্যথা দিচ্ছি, হয়তো কত সময় তোমার চোখের জলও ঝরে পড়ে—"

"না না, তুই তো আমায় কোনদিন ব্যথা দিসনি ব্রজ—"

মা পরম স্নেহে তাহার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। ব্রজেশ্বর বলিল, "বল মা, কি বলবে? আচ্ছা আমিই বলছি শোন। প্রজারা এবং তাদের লিডার জিতেন চৌধুরী মোকর্দ্দমায়

জড়িয়ে পড়েছে, তাদের যাতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই কথাই বলতে তো এসেছ মা ? কিন্তু শোন মা, ওরা মুক্তি কিছুতেই পাবে না, ওদের মুক্তি দেওয়াও সম্ভব নয়। আজ যদি ওরা মুক্তি পায়, তার ফলে কি হবে জানো মা ? এই জমিদারীর কোন প্রজা আমাদের মানবে না, একটি পয়সা খাজনা দেবে না, আমাদের নাম পৃথিবীর বুক হতে ওরা লোপ করে দিতে চাইবে, তুমি কি তাই চাও মা—?"

ক্ষীণ কণ্ঠে সুরমা বলিলেন, "তাই কি চাইতে পারি ব্রজ ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন আমরা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি তাতে এক পক্ষকে হটতে হবেই, হয় ওরা—নয় আমরা। আমাদের শক্তিকে বড় বলতে পারো না মা, অর্থ সম্পদ থাকলেই মানুষ বড় হতে পারে না। বড় করা—ওই প্রজাদের . শক্তি,—সেইজন্যে আমাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে ওদের শাসন করেও বশ্যতা স্বীকার করাতেই হবে।"

সুরমা বলিলেন, "এ রকম ভাবে নির্য্যাতন না করে কি বশ্যতা স্বীকার করা চলে না ?"

ব্রজেশ্বর উঠিয়া বসিল,—একটু হাসিয়া বলিল, "তা হলে দেশ শাসন করবার জন্যে আইনের কোন দরকারই হতো না মা। আজ ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে ওদের বশে আনতে চাও ওরা তোমায় শক্তিহীন ভেবে মাথায় উঠতে চাইবে। বুঝলে মা, যে যেমন তার সঙ্গে ঠিক তেমনই ব্যবহার করতে হবে,—সেই জন্যেই ওদের চাই বেত, জুতো, কানমলা, সেই জন্যেই ওদের চাই জেল—অর্থদণ্ড ; বুঝলে ?"

সুরমা নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন।

ব্রজেশ্বর বলিয়া চলিল, "আর বলতে চাও জিতেন চৌধুরীর কথা। তিনি যদি ওই প্রজাদের পক্ষ নিয়ে না দাঁড়াতেন, তাহলে প্রজারা অমন দুর্দ্ধর্ষ হতে পারত না মা,—এ দোষ তাই প্রজাদের যত নয়—ততটা জিতেন চৌধুরীর আর তাঁর মেয়ে—আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে পারমিতার।

শেষের দিকটায় তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ফুটিল কেবল দারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞা।

সুরমা বলিলেন, "পারমিতার অপরাধ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "জিতেন চৌধুরীর চেয়েও বেশী। দম্ভ তার প্রচুর—বাপকে দিয়ে সেই এই সব কাণ্ড করিয়েছে! তাকেই আমি শাসন করতে চাই মা, তার বাপকে ঠিক অমনই করে নির্য্যাতনের শেষ ধাপে টেনে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেব—শিক্ষা এবং তার গর্ব্বটাই মানুষের যথেষ্ট নয়, তারও অতীত আরও কিছু আছে।"

আর্ত্তকণ্ঠে জননী বলিলেন, "ছি ছি, অবশেষে একটী মেয়েকে জব্দ করতে তুই এমন ভাবে নিজেকে অনেক উচু হতে নীচের ধাপে নামিয়ে ফেললি ব্রজ—?"

ব্রজেশ্বর মুখ তুলিল—

হাঁ মা। দেখতে সে মেয়ে, কিন্তু প্রকৃতিতে সে পুরুষ। ভয় পেয়ো না মা—নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি তার অনেক বেশী, অনেক আঘাতই সে সইতে পারে। আমিও তাকে মেয়ে বলে প্রথমে অবহেলা করে-ছিলেম, এখন দেখছি তার শক্তি অনেক পুরুষের চেয়ে বেশী, কাজেই তাকে শাসনে আনা বিশেষ দরকার।"

সুরমা বলিলেন, "শেষে মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নাম্‌লি ব্রজ, যদি পরাজিত হোস্, সে কলঙ্ক-কালি মেখে দুনিয়ায় মুখ দেখাবার জায়গা কি তুই পাবি?"

ব্রজেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল, "প্রতিদ্বন্দ্বীতা নয় মা, একে প্রতিদ্বন্দ্বীতা বলতে আমি ঘৃণা বোধ কার, একে শাসন করার কৌশল বরং বলতে পারো। তোমার আশীর্ব্বাদ যাদ থাকে মা—হোক্‌না সে অসীম শক্তিময়ী, তবু তাকে দলতে পারবই, তাকে কখনও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবনা—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

সে নত হইয়া মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল—

সুরমা আড়ষ্ট ও নিস্পন্দভাবে কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

*

*   *

জিতেন চৌধুরীর শরীরটা তত ভালো নাই, পারমিতার কলিকাতায় যাইবার দিন আসিতেছে, একমাস ছুটি লইয়া সে আসিয়াছিল, এক মাস ফুরাইয়া আসিয়াছে। সামনে আর দুইমাস পরেই মার্চ্চ মাসে একজামিন, পারমিতা সে জন্য প্রস্তুত হইতেছে।—

সে এবার পিতাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। ভোলার উপর নির্ভর করিয়া পিতাকে এখানে রাখিয়া যাইবার ভরসা এবার তাহার নাই। জিতেন চৌধুরীর স্বাস্থ্যও এবার ভাঙ্গিয়া গেছে, কিছুতেই শুধরাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

কাল মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রধান আসামী বলিয়া মতিলাল, বদিরুদ্দিন, আব্‌দর, দেবেন ও ভিখু মণ্ডলের জেল হইয়াছে, আর কয়েকজনের জরিমানা হইয়াছে, জিতেন চৌধুরীকেও জরিমানা দিতে হইয়াছে, জেলে যাইতে হয় নাই।

কিন্তু অর্থদণ্ড দেওয়ার চেয়ে উহাদের সঙ্গে জেলে যাওয়াই বুঝি ভালো ছিল। তাহারা জেলে যাইবার আগে কাঁদিয়া বলিয়া গিয়াছে— "ওদের দেখবেন বাবু—আমাদের ছেলেপুলে পরিবার যেন না খেয়ে অসুখে ভুগে মারা না যায়।"

পারমিতাও সেখানে ছিল।

এই লোকগুলোর চোখের জল তাহার মনে এতটুকু করুণা উদ্রেক করিতে পারে নাই, দারুণ ঘৃণা উৎপন্ন করিয়াছিল।

এ সব লোকদের এতটুকু করুণা করা যায় না। এত দুর্ব্বল ইহারা—দণ্ডের আদেশ পাইবার এতটুকু আগে ক্ষমা চাহিয়া বসিয়াছে, ব্রজেশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। ব্রজেশ্বরের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি

ফুটিয়াছিল, সে দূরে আসীনা পারমিতার পানে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল মাত্র।—

ঠিক, সে তখন নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল—জিতেন চৌধুরী মুক্তি পাইয়াছেন, প্রজারা জেলে গিয়াছে পারমিতার তাহাতে এমন কিছু ক্ষতি হয় নাই। সে তো তাহার পিতাকে ফিরিয়া পাইয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট লাভ।

কিন্তু সব গিয়া জিতেন চৌধুরী যে ফিরিয়া গৃহে আসিলেন—এ যে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার পক্ষে কতখানি লজ্জার কথা—কতখানি গ্লানির কথা তাহা বুঝিবে কে?

আত্মবিস্মৃত জিতেন চৌধুরী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"আমি ফাইন দেব না হুজুর, আমায় ওদের সঙ্গে জেলে যাওয়ার আদেশ দিন।"

কিন্তু এই জরিমানার টাকা দিল একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক—যাহাকে পারমিতা চেনে না, জিতেন চৌধুরীও চেনেন না।—অনাদি চক্রবর্ত্তীর নাম তাহারা জীবনে কোনদিন শুনিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না, অথচ কোর্টে দাঁড়াইয়া সেই লোকই অতগুলো টাকা দিয়া গেল।—

কালো মুখে পিতা-পুত্রী ফিরিয়া আসিয়াছেন নিজেদের বাড়ীতে।

এই একটু আগে জমিদার অবনী রায়ের বাড়ী হইতে ঢাক ঢোল বাজাইয়া কতজন লোক পূজার কত উপচার বহিয়া আনিয়াছে গ্রাম্য-দেবীর মন্দিরে। পাশাপাশি গ্রাম—এমন কি পাড়া বলাও চলে, অনেক মানসিক পূজা বাড়ী হইতেও আসে।

চৌধুরীবংশের স্থাপিতা গ্রাম্যদেবী, মন্দিরও কোন এক পূর্ব্ব পুরুষ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন, পূজাও করে এ বংশেরই কুলপুরোহিত।

কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিল চৌধুরীবংশের দেবীর নিকট শত্রু রায়বংশের পূজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক, পুরোহিত যেন পূজা না করেন। স্পষ্ট জানাইয়া দিতে যদি চক্ষুলজ্জায় বাধে, দরজায় চাবি দিলেই যথেষ্ট হইবে। উহারা পূজা ফিরাইয়া লইয়া যাক, নিজেরা দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করুক।—

একদিন পারমিতাও এ কথা বলিয়াছিল এবং নিজেই মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

পিতা হাসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—মন্দির দ্বার রুদ্ধ করা যাইতে পারে না, দেবতার পূজাও বন্ধ করা যাইতে পারে না। তাহার বংশের স্থাপিত বিগ্রহ হইলেও দেবতা সকলের, তাঁহার দাবী সকলের পরে।

চিরাচরিত রীতি আজও তিনি মানিয়া আসিতেছেন। সকলের পূজা হইয়া গেলে চৌধুরীবাড়ীর পূজা হয়, সকলে প্রণাম করিয়া গেলে তাঁহারা প্রণাম করেন। সাধারণের দাবী আগে তাহার পর তাঁহাদের। পাছে কেহ মনে করে তাঁহার বংশের দেবতা বলিয়া তিনি এতটুকু অধিকারের দাবী করিতে চাহেন, সেই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকেন।

আজও সেই মন্দিরে পুজা গিয়াছে।

এ পূজা চৌধূরীবংশের সম্পুর্ণ পরাজয়ের ও রায়বংশের সর্ব্বতো-ভাবে জয়লাভের জন্য। অবনী রায় এ উদ্যোগ করেন নাই, করিয়াছে ব্রজেশ্বর।

এই বাড়ীরই পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া পূজা যাইবে, গর্ব্বিতা পারমিতার গর্ব্ব সকল রকমে ধ্বংস করিতে সে পূজার আয়োজন করিয়াছে প্রচুর।

সকলের আগে ছিল সে—

পারমিতা কি দেখে নাই ?

হাঁ, অন্ততঃপক্ষে এক পলকের দৃষ্টিপাতে সে দেখিয়া লইয়াছে। সকলের আগে চলিয়াছে ব্রজেশ্বর, মুখ তাহার আনন্দে দৃপ্ত—বক্ষ স্ফীত, পেশীবহুল হাত দু'খানা আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রাখিয়া গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে সে চলিয়াছে। একবার চকিতে তাহার দৃষ্টি ইট-খসা লোণা-ধরা প্রকাণ্ড বড় বাড়ীটার উপর সে বুলাইয়া লইয়াছিল।

অসহ্য মর্ম্মযাতনায় পারমিতা অস্থির হইয়া উঠিল,—তাহার মনে হইতেছিল অন্ততঃপক্ষে দিন পনের আগেও যদি সে মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিত আজ তাহা হইলে এমন অপমান তাহাকে সহ্য

করিতে ইহত না, গর্ব্বিত চরণে ব্রজেশ্বর এমন করিয়া তাহার বুকের প্রতি হাড়খানা গুঁড়াইয়া দিয়া যাইতে পারিত না।

আজ প্রথম যেন সে ঘরখানার দিকে—সমস্ত বাড়ীখানার দিকে তাকাইয়া দেখিল।

তাই তো,—কি আর আছে? চূণ নাই, বালি নাই, লোণা ধরা ইটগুলা যেন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সামনের দিক্‌কার সিংহদ্বারের সিংহ কবে লীন হইয়া গেছে, দুই দিক্‌কার বড় বড় থামগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাহিরের অত বড় উঠানটা জঙ্গলে ভরিয়া গেছে, মাঝখানে জাগিয়া আছে সরু পথ; যাতায়াতের ফলে আজও জাগিয়া আছে নহিলে কবে উহার অস্তিত্বও বিলীন হইয়া যাইত।

ভোলার দুর্ব্বল হাত আজ দা' কোদাল ধরিতে কাঁপে। একদিন ছিল যখন ভোলা নিজের হাতে সব পরিষ্কার করিত, ওই উঠানে একটী ঘাস পর্য্যন্ত সে জন্মাইতে দেয় নাই,—যতদূর সাধ্য সে দেয়ালে চূণ বালি দিয়া ভাঙ্গা গুলাকে তালি দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। আজ সে বসিয়া শুধু দীননেত্রে চাহিয়া থাকে, কিছু করিবার ক্ষমতা সে হারাইয়াছে।

প্রথম প্রথম হয়তো দীনতা-টা এতটুকু চোখে পড়িত, এখন সবই সহিয়া গেছে। কোন ঘরের কড়িকাঠ ঝুলিয়া আছে, যে কোন মুহূর্ত্তে পড়িয়া যাইবে, তাও নিঃশব্দে নয়, প্রচণ্ড শব্দ তুলিয়া জানাইয়া দিয়া যাইবে সে চলিয়া গেল। কত ঘর পড়িয়া গেছে, জানাইয়া দিয়া গেছে তাহারা চলিয়া গেলে, আর আসিবে না।

অত বড় বাড়ীটায় তিনটী মানুষ, থাকে দু'জন মাত্র, পারমিতা ছুটিতে আসে।

এই ভাঙ্গা বাড়ী আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে ওই দুই বৃদ্ধ, ভোলা ও জিতেন চৌধুরী।

যতদিন একখানি ইট কাঠ থাকিবে, ততদিন তাঁহারা এমনই করিয়া বসিয়া থাকিবেন। এক একটা ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে, জিতেন চৌধুরী হাসেন— আর ভোলা ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস।

কত দীর্ঘনিঃশ্বাসই না এই সব ইটের ফাঁকে ফাঁকে জমিয়া আছে, কত গভীর রাত্রে ঝরিয়া পড়া চোখের জল—

কত কাল মেরামত হয় নাই, পারমিতার ঠাকুরদা'র আমল হইতে।

তবুও ভাঙ্গা বাড়ীর দৈন্যতা আজ যেমন স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, এমন ভাবে আর কোনদিনই ফুটে নাই।

পারমিতা দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল কোন দিকে তাকাইবার শক্তি তাহার যেন ছিল না।

*

* *

জিতেন চৌধুরী একখানা চৌকির উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন, নিকটেই বসিয়াছিলেন তারাপদ গাঙ্গুলী।

ভোলা ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল। এ বাড়ীতে তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা বেশই ছিল, সকল জাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন করা হুঁকা এবং কলিকা থাকিত।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের বয়স হইয়াছে, মাথার সব চুলই কবে সাদা হইয়া গিয়াছে, দাঁত সবই পড়িয়া গিয়াছিল, বাঁধাইয়া দুই পাটিই নূতন করিয়া লইয়াছেন। লোকে এ জন্য তৃতীয় পক্ষেরই নাম করে।

শরীরটা তত ভালো নাই, কাল রাত্রে বেশ একটু জ্বর হইয়াছিল, এখনও হয়তো একটু লাগিয়া আছে।

তারাপদ গাঙ্গুলী তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছিলেন, "চমৎকার তামাক-টি চৌধুরী, মনে হচ্ছে এমন তামাক অনেককাল খাইনি, কোথাকার তামাক বল তো হে?"

জিতেন চৌধুরী একটু হাসিয়া বলিলেন, "গয়া হতে আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছে—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বিস্ফারিত চোখে বলিলেন, "বটে, তা বলতে

হয়? কবে আনলে বল দেখি? আঃ, আগে একটু জানাতে হয়, তাহলে বলতুম আমার জন্যে একপোয়া, নিদেন পক্ষে আধ পোয়া আনিয়ে দিতে।"

জিতেন চৌধুরী ভোলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "খানিকটা তামাক গাঙ্গুলী মশাইকে এনে দে তো ভোলা--।"

অসন্তুষ্টভাবে ভোলা উঠিল—

সামনে যে তামাক আসিল তাহার পরিমাণ আধ সেরের কম নয়।

প্রসন্নতার হাসিতে গাঙ্গুলী মশায়ের সমস্ত মুখখানা ভরিয়া উঠিল—

অত আর কেন, এক ছিলিমের মত দিলেই হতো। ওই জন্যেই তো তোমার কাছে কোন কথা বলতে লজ্জা করে হে। বলতুম না—নেহাৎ কি যে হ"লো—ফস্ করে মুখ দিয়ে কথাটা বার হয়ে পড়ল—"

বাধা দিয়া জিতেন চৌধুরী বলিলেন, "তাতে আর কি হ'লো তারাপদ, তামাকটা সত্যিই ভালো,—নিয়ে যাও, দু'দিন তোমার খাওয়া হবে এখন।"

তারাপদ গাঙ্গুলী আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেম, বারবার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—"তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক ভায়া, মেয়েটির ভালো ঘরে ভালো বরে বিয়ে হোক,—নাতি নাতনীতে তোমার ঘর ছেয়ে ফেলুক—"

জিতেন চৌধুরীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—তাই বটে, লোকে আশীর্ব্বাদ করে তাহাই, প্রার্থনা করে তাহাই, কিন্তু কয়জনের প্রার্থনা বা আশীর্ব্বাদ সফলতা লাভ করে—কয়জন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়?

সেদিন এক ভিখারী আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক—"

এ আশীর্ব্বাদের মূল্য অনেক, কিন্তু এ আশীর্ব্বাদ সফল হইবার ভিত্তি কোথায়?

তাই না মনে হয় সবই ফাঁকা, মূল্য কিছুরই নাই, সবই মিথ্যা।

তারাপদ গাঙ্গুলী উঠিতে উঠিতে আসিলেন, নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য।—

"হাতে কি গাঙ্গুলী মশাই ?"

আমতা আমতা করিয়া তারাপদ গাঙ্গুলী বসিলেন, "এই একটু তামাক। চৌধুরীর কোন বন্ধু গয়া হতে খুব ভালো তামাক পাঠিয়েছে, একটু প্রশংসা করেছি কি অমনি চৌধুরীর হুকুমে এই খানিকটা তামাক নিতে হ'লো। না বললে ও কি শোনে ?"

নিশিকান্ত বলিলেন, "ওই তো ওঁর ব্যারাম। ওঁর মত লোক আছে বলেই না আজও এখানকার গরীব লোকেরা খেতে পরতে পাচ্ছে, নইলে দেখতেন সব কি অবস্থা হতো ? বলি—জানতে তো বাকি নেই গাঙ্গুলীমশাই,—সেবার ওই মধু বেটা খেতে না পেয়ে অবনী রায়ের বাড়ীতে দু'দিন হত্যে দিয়ে পড়েছিল। সামনে সেই অভুক্ত লোকটাকে রেখে ওরা যে সব কি করে খেলে আমি তাই ভেবে পাইনে। উঃ, তাই না ভাবি, ওরা মানুষ না পিশাচ,—কেউ এ রকম করতে পারে, বলুন দেখি ?"

গাঙ্গুলী কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে প্রবেশ করিল পারমিতা—তারাপদ গাঙ্গুলীর আর কথা বলা হইল না।

পারমিতা কাহারও পানে তাকাইল না, সোজা পিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

নত হইয়া তাঁহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "এখনও তো একটু জ্বর রয়েছে বাবা, আর এই অসুস্থ শরীরে বেশ বকছো যা হোক, ওতে আরও মাথার যন্ত্রণা ধরবে যে।"

তারাপদ গাঙ্গুলী একটু হাসিয়া বলিতে গেলেন, "মা লক্ষ্মীর সব দিকে নজর, সেই জন্যেই তো—"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পারমিতা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "থাক, আর অযাচিত প্রশংসাগুলো অনর্থক ব্যয় নাই করলেন। মনে রাখবেন আমি বাবা নই যে এতটুকু প্রশংসা করলেই গলে জল হয়ে যাব আর যা কিছুর নাম করবেন তাই দিয়ে বসব।"

নিশিকান্তের পানে তাকাইয়া সে বলিল, শত্রু হয়েই যদি দাড়াতেন ভশ্চাযমশাই সে ভালোই হতো, অমন করে মিত্রের বেশ ধরে এই

শিবতুল্য লোকটিকে যে আপনারা প্রতারণা করেন এটা ভারি কষ্টের কথা। আজ যাঁর নামে এতগুলো কথা বলছেন—সত্যি তিনি যে অত খারাপ লোক নন্ তা আমি জানি।

মধু তাঁর দরজায় দু'দিন কেন—দু'ঘণ্টাও হত্যে দেয়নি, তাঁর ছেলে মধুকে অনেক কিছু দিয়ে বিদায় করেছেন এ কথা আপনিও যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। আমি এ কথাও জানি ভশ্চায মশাই, আপনি তাঁদের ওখানে সকাল সন্ধ্যে হাজরে দেন,—সব রকমে তাঁদের মন জুগিয়ে চলেন, আর এখান ওখান হতে খবর জোগাড় করে তাঁদের দেন। শত্রু আপনি—শত্রুর বেশেই থাকবেন, মিত্রের বেশে সর্ব্বনাশ করবেন না এই মিনতি করি আপনার কাছে।"

নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল—

রুদ্ধশ্বাসে তিনি বলিলেন, "তুমি একথা বলছো পারমিতা—তুমি ?"

দৃঢ়কণ্ঠে পারমিতা বলিল, "হাঁ, আমিই বলছি ভশ্চাযমশাই, এই যে লোকটীর কাছে আজ আপনি এসে অজস্র স্তুতিবাদ করে যাচ্ছেন ইনি আপনাকে চেনেন না—অর্থাৎ বার হ'তে আপনাকে চিনলেও আপনার ভেতরকার মানুষটার পরিচয় পান্নি। ওকে আজ আপনার সত্যকার পরিচয় দিলেও উনি বিশ্বাস করবেন না, কেন না মানুষকে উনি কোন-দিনই সে চোখে দেখেননি তাই আজ দুর্গতির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। যদি মানুষকে উনি চিনতে পারতেন, তাহলে আজ আপনার অন্নদাতা প্রভু অবনী রায় এত বড় হতে পারতেন না,—আজ অত জাঁক করে মন্দিরে পূজো দেওয়াও তার হতো না ভশ্চাযমশাই।"

জিতেন চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন—ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "আঃ, ওসব কি হচ্ছে মিতা—ছিঃ—"

পারমিতা বলিল, "না বাবা, তুমি জানো না এরা কি, সেই জন্যেই ওঁদের অত বিশ্বাস করছো। এই ভশ্চায মশাইও এসেছেন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কোনও একটা মহৎ উদ্দেশ্য এর মধ্যে রয়েছে, আমি না এলে সেটা এখনই তুমি শুনতে পেতে। তোমায় তো জানি বাবা,

এমনি করে তোমায় ঠকিয়ে ওরা নিজেদের উপায় করে নিচ্ছেন তা যদি তুমি বুঝতে—”

সে আবার ফিরিল, হাতখানা বাড়াইয়া দরজা দেখাইয়া দিয়া বলিল, “এখন দয়া করে আপনারা বিদায় নিন্ দেখি। দেখছেন মানুষটা জ্বরে পড়ে রয়েছে, তবু যে অনর্থক খোসামোদ করতে এসেছেন, এর জন্যে সত্যিই আপনাদের প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে।”

বিনা বাক্যব্যয়ে গাঙ্গুলী ও ভট্টাচার্য্য বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িয়া জিতেন চৌধুরী বলিলেন, “ছিঃ, ছিঃ, লোকের কাছে আমার মুখ দেখানোর পথ বন্ধ করলে মিতা—?”

তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে পারমিতা বলিল, “মুখ দেখানোর পথ তো বন্ধ হয়ে গেছে বাবা, আমি বন্ধ করিনি। এই সব কপট বন্ধুর সাহচর্য্য হতে যদি আমি তোমায় রক্ষা করতে পারি, তবেই জানব আমি তোমার সন্তানের উপযুক্ত কাজ করছি বাবা। আজ ওরাই যে পূজোর জিনিষ বয়ে নিয়ে চলছিল, ওই ভশ্চাযের আস্ফালন তুমি তো দেখনি বাবা—”

জিতেন চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “তাতে আমার কতটুকু লাভ ক্ষতি হলো মা?”

পারমিতা বলিল, “হয়নি আর হবেও না তা জানি বাবা, নইলে যে অবনী রায়—”

রোষে ক্ষোভে সে চোখের জল ফেলিল!

জিতেন চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন, “দোষটা সবই তার মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছো মা, তোমার বাপের দোষটা দেখতে পাচ্ছো না? অমন এক তরফা বিচার করো না মা, ওটা বাস্তবিকই ভালো নয়। অবনী রায়ের কি ক্ষমতা হতো এমন ভাবে সব বিষয় সম্পত্তি বন্ধক রাখবার, ও দোষটা কেন দেখছ না মা? তোমার বাপের পানাশক্তির কথা না জানে এমন লোক এ গ্রামে আছে কি?”

পারমিতা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, “তাই বলে সে এমন জুয়াচুরি করবে, পঞ্চাশ টাকার হ্যাণ্ডনোট পাঁচ হাজার করে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে?

তুমি তো কোন মানুষকেই খারাপ দেখ না বাবা, দোষ কারও দেখতে পাও না, কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সব। এক তরফা বিচার আমি করিনে বাবা, কর তুমি। আজ তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে ওরা হ'লো বড়লোক, কাল মোকর্দ্দমায় জিতে আজ এই খানিক আগে ঢাক ঢোল বাজিয়ে মহা সমারোহে তোমারই দেবীমন্দিরে ওরা গেল পূজো দিতে—"

"আমার দেবী মন্দিরে—"

জিতেন চৌধুরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "পাগ্‌লি, দেবতা কারও একা হতে পারে, দেবতার উপরে কেউ স্বত্ব স্থাপন করতে পারে কি? অসীমকে সীমাবদ্ধ করতে যে চায় সে মূর্খ, সে পাগল। ও মন্দিরে সবাই যে পূজো দিতে পারবে মা, সবারই সে অধিকার আছে।"

পারমিতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া সে পিতার বুকে মুখ লুকাইল—

পিতা নিস্তব্ধে তাহার মাথায় কেবল হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।—

*

* *

মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়া ব্রজেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে প্রতিমার সামনে ও কে বসিয়া? খোলা চুলগুলা পিঠ ছাড়াইয়া খানিকটা মাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; লালপাড় শাড়ীর খানিকটা পাড় দেখা যাইতেছে।

দরজার সামনে বারান্দায় বসিয়া আছে ভোলা, জিতেন চৌধুরীর পুরাতন ভৃত্য। ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল।

মন্দিরে কে রহিয়াছে তাহা বুঝিতে ব্রজেশ্বরের বিলম্ব হইল না।

বিনীত কণ্ঠে ভোলা বলিল, "মন্দিরে দিদি রয়েছেন ব্রজবাবু,—"

দর্পিত ব্রজেশ্বর বলিল, "কিন্তু আমাকেও যে এখনি মন্দিরে ঢুকতে হবে, দেরী করলে চলবে না।"

ভোলার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, যতদূর সম্ভব নরম ভাবেই সে বলিল, "একটু পরে এলে হবে না বাবু, দিদি এইমাত্র এসেছেন?"

ব্রজেশ্বর ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এ তো এ বংশের প্রথা নয় ভোলানাথ, কেউ এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে—ওরা মন্দির অধিকার করে থাকবেন।"

পারমিতার কানে এ কথা পৌঁছাইল, সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

চুলগুলো এলো মেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িল মুখ চোখের উপর; সেগুলো সরাইয়া পিছনে ফেলিয়া সে দরজার উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। দৃপ্তকণ্ঠেই বলিল, "ঠিক কথাই বলেছেন ব্রজবাবু, কিন্তু মাপ করবেন, আমি জানতেম না আপনি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। জানলে অনেক আগেই উঠে পড়তেম—

কি দৃপ্তা মহিমময়ী মূর্ত্তি. দাঁড়াইবার ভঙ্গীটিও কি সুন্দর, ততোধিক সুন্দর তাহার দৃপ্ত কথাগুলি; সাম্রাজ্ঞীর আদেশের মতই।

ব্রজেশ্বর নিস্তব্ধে কেবল তাকাইয়া রহিল।

পারমিতা ডাকিল, "চল ভোলা-দা, আমার প্রণাম করা হয়ে গেছে। ওঁকে বল—উনি এবার মন্দির দখল করুন, ওঁর পুরোহিত নিয়ে আসুন। আমরা মন্দিরের স্বত্ব ত্যাগ করলেম।"

ধীরপদে সে অগ্রসর হইল,—ধীর হইলেও গর্ব্বিত পাদক্ষেপ, মৃদু শব্দটার তালে তালে হৃৎপিণ্ডও স্পন্দিত হয়।

একটা মেয়ে—কতখানি অবজ্ঞা দেখাইয়া কতখানি অবহেলা করিয়া সে চলিয়া যায়, ব্রজেশ্বরের মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠে।

সে ডাকিল, "দাঁড়ান, কথা আছে।"

পারমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল, "আমায় ডাকছেন?"

ব্রজেশ্বর অগ্রসর হইয়া আসিল, পরুষ ভাবেই বলিল, "হাঁ,—আপনাকে বলছি।"

গর্ব্বিতকণ্ঠে পারমিতা বলিল, "বলুন, কিন্তু মনে রাখবেন কেবল ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই আমি দাঁড়িয়েছি, জমিদারের আদেশ পালনের জন্যে নয়।"

ব্রজেশ্বর অপমানে নির্ব্বাক হইয়া গেল, পরমুহূর্ত্তে ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি অনেক কথাই বলে যাচ্ছেন, উত্তর দিতে গেলে সত্যিই ঝগড়া বেধে যায়—"

বাধা দিয়া পারমিতা বলিল, "বেশ তো—করুন না ঝগড়া; কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, পারবেন তো ঝগড়া কর্‌তে? আমার মনে এতদিন ধারণা ছিল ঝগড়া করা মেয়েদেরই একচেটে প্রথা, সে ধারণা যে ভুল তা এখনই বুঝছি।"

কি ক্ষুরধার কথা, ইহার জিহ্বায় কি কাঁটা॥

ব্রজেশ্বর রাগিয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত ঝগড়া করিতে পারিল না।

"পারমিতা দেবী—"

সে বলিল, "আপনি মেয়ে বলেই ঝগড়ার সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে নিজেকে গর্ব্বিতা মনে করতে পারেন। এইখানেই আপনাতে আমাতে পার্থক্য যে কতখানি তা বোঝা যাচ্ছে—কাজেই কেবল মুখের কথায় যারা বড় হয় তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি নিজেকে অহঙ্কৃত মনে করতে পারিনে।"

পারমিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি কি এই কথা বলবার জন্যেই আমায় ডেকেছেন?"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল, "না আমি আপনাকে জানাতে চেয়েছিলেম আমি মন্দির অধিকার করতে আসিনি।"

পারমিতা হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া বলিল, "চমৎকার কথা, কিন্তু আমার প্রণামে বাধা দিয়ে, এক রকম প্রায় জোর করে উঠিয়ে

দিয়ে এখন যদি বলেন মন্দির অধিকার করতে আসিনি, সে কথাটা আমার কাছে পরিহাস বলেই মনে হবে ব্রজবাবু।"

প্রায় প্রতিধ্বনির মতই ব্রজেশ্বর বলিয়া উঠিল—"পরিহাস—?"

মুখের কথা শেষ না হইতেই পারমিতা বলিল, "হাঁ, পরিহাস, অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে জুতো মেরে গরু দান। এই খানেই বংশগৌরব ধরা পড়ে যায় ব্রজবাবু, কথায় নয়—কাজে ফুটে ওঠে! মন্দির অধিকার আর কাকে বলে, আমায় দ্বারোয়ান দিয়ে বার করে দেওয়া নাকি?"

ব্রজেশ্বর একেবারে নিভিয়া গেল—"আপনি কি বলছেন পারমিতা দেবী?"

পারমিতা বলিল, "হাঁ, তা আপনারা—মানে আপনি আর আপনার বাবা পারেন, সে বিষয়ে আমি এতটুকু সন্দেহ করিনে। যারা দশ টাকা ধার দিয়ে দশের পিছনে তিনটে শূন্য বসিয়ে পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে চলে, মিথ্যে করে কোর্টে ফাইন দেওয়ায়, তারপর সেই নির্য্যাতীত অপমানিত হতভাগ্যের ঘরের সুমুখ দিয়ে মহাসমারোহে যারা জয়ের আনন্দে পুজো দিতে যায়, তারা কি পারে না দুর্ব্বলা একটী মেয়েকে দ্বারোয়ান দিয়ে বার করে দিতে? ও সবের চেয়ে এ অপমান কি আরও বেশী অনুভূত হবে ব্রজবাবু?"

ব্রজেশ্বর একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

"এসো ভোলা-দা, আর কথা নয়, দেরী হয়ে যাচ্ছে—"

দ্রুতপদে চলিতে গিয়া সে থামিয়া ফিরিল, বলিল, "আমাদের ভশ্চায মশাইকেই পুরোহিত রাখবেন। আজ হতে আপনাদেরই সব হোলো ভেবে যেন জোচ্চোর নিশিকান্ত ভশ্চাযকে পুরোহিত করবেন না, আপনার কাছে কেবল এই অনুরোধ করে যাচ্ছি।"

সে এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, এবং বৃদ্ধ ন্যুব্জ দেহ ভোলাও এত শীঘ্র তাহার অনুসরণ করিল যে; ব্রজেশ্বর আর একটী কথা বলিবারও সময় পাইল না।

কি জ্বলন্ত কথাগুলাই সে বলিয়া গেল, যেন বুকের মধ্যে ছুরি

বসাইয়া অনেকগুলা ক্ষত উৎপন্ন করিয়া দিল! এ ক্ষতে দেওয়ার ঔষধ মিলিবে না, এই যা দুঃখ, ঔষধ দিতে পারিলে জ্বালার কতকটা উপশম হইত।

অতি সত্য কথা তাহাতে ভুল নাই। ব্রজেশ্বর খাতাপত্র সবই দেখিয়াছে—লোকের মুখেও শুনিয়াছে। পিতার মুখে তাঁহার নিজের কাজের উল্লেখ সে শুনিতে পায় নাই, না পাইলেও সে জানে লোকে যাহা বলে তাহা মিথ্যা নহে।

তবু মুখে স্পষ্ট কেহ সে সব কথা বলিয়া গেলে গায়ে বাজে।

এমন মেয়েকে অপমান করাই ভালো—সেইটাই উচিত।

এবং তাহারই প্রধান উপায় নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্যকেই পুরোহিত পদে নিয়োজিত করা।

বাড়ী ফিরিয়াই সে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিল। আগামী কাল হইতে মন্দিরে পুরাতন পুরোহিতের পূজার অধিকার রহিল না, পূজা করিবেন নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য।

অবনী রায়ের কানেও এ কথা পৌঁছাইল। তিনি বলিলেন, "কাজটা ভালো হোলো না ব্রজ, ওই শ্যামচাঁদেরই বংশ চিরকাল ধরে ও মন্দিরের পুজো করে আসছে, আজ যে আমার আমলে অন্য কোন পুরুত পুজো করবে সেটা উচিত মনে হয় না। ওরা যেমন পুজো করছে তেমনই করুক, নিশিকান্তকে আর ওর মধ্যে নিয়ো না।"

ব্রজেশ্বর সবেগে মাথা নাড়িল, বলিল, "না বাবা, আমি শ্যাম ভশ্চাযকে দিয়ে ও মন্দিরে পুজো করাব না। ওরা যখন সব স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছে তখন ওদের কথা বলবারও অধিকার নেই। আমি আমার ইচ্ছামত নিশিকান্ত ভশ্চাযকে দিয়েই পুজো করাব, এতে কারও কথা শুনব না।"

পুত্রের মধ্যে বংশের তেজ প্রত্যক্ষ করিয়া অবনী রায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন—

সুরমা, এমন কি বিনীতাও বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল—স্পষ্টই বলিল,

"দেবতার মন্দিরে হাত দিতে যেয়ো না ব্রজ, পূজো যেমন চলছে তেমনই চলুক।"

ব্রজেশ্বর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমরা এ সব কিছু বুঝবে না পিসী। যাই হও—আটটা ভাষাই শেখ, আর রাশি রাশি বই-ই পড়ে যাও, তবু তোমরা যা তাই-ই থেকে যাবে। যে যার নিজের কাজ কর গিয়ে, এর মধ্যে থেকে কথা বলতে এসো না বারণ করছি।"

মুখ কালো করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বিনীতা সরিয়া গেল, সরিলেন না সুরমা।

পুত্রের হাত তু'খানা ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কেন এ রকম করে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলছিস ব্রজ? এদিকে তুই যে যা খুসি তাই করছিস, তাতে তো একটি কথাও বলিনি, কিন্তু দেবতার কোপে যে আমার বংশ নির্ব্বংশ হবে এ আমি সইতে পারব না ব্রজ, এ আমি হতে দেব না। যদি দেবীর মন্দিরে তুই এ রকম অত্যাচার করতে যাস, আমি তোর সামনে রক্তগঙ্গা তৈরী করব—নিজের গলায় ছুরি বসাব।"

পাগলের মত হাসিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এমন বংশ নাই বা রইলো মা? যে বংশের প্রতিষ্ঠা গর্বের মধ্যে, যে বংশের যশ লোকের মুখে মুখে ফেরে অত্যাচারী শাসকের রূপে, তুমি কি মনে কর সে বংশ থাকবে? মন্দিরে যার পূজো হয় সে তো প্রাণহীন একটা পুতুল, সত্যিকার ভগবানকে নিত্য কত রকমে পায়ে দলছি, কত প্রজাকে জর্জ্জরীভূত করছি, ভগবানের কত মন্দির জ্বালিয়ে ছার খার করে দিচ্ছি, তা কি দেখতে পেয়েছ মা? মানুষের বুকের লক্ষ দেবতা আজ আর্ত্তনাদ করছে—কত প্রতারণা চলছে, কত চোখের জল ঝরছে, তারই আয়োজনের প্রারম্ভে যদি সত্যি আত্মহত্যা করতে পারতে, রক্তগঙ্গা বহাতে, তবু কাজ হতো। আজ একটা প্রাণহীন প্রতিমা—সে পেলে তোমাদের কাছ হতে দেবতার সম্মান, তার মন্দির হোলো তোমাদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থস্থান?"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া সুরমা ডাকিলেন, "ব্রজ—"

ব্রজেশ্বর বলিয়া চলিল, "সত্যি কথাই বলছি মা, অপরাধ নিয়ো না। এই রায়-বংশের জমিদারী—কতটুকুর মধ্যে এ সীমাবদ্ধ ছিল। আজ এ জমিদারের সীমানা কতখানি,—কত গ্রাম এর মধ্যে পড়ছে, কত লোকের প্রভু আমি। বলতে পারো মা—কতখানি প্রবঞ্চনা করে এ বিশাল জমিদারী এসেছে হাতে? সদাশিব তুল্য একজন লোক,—মানুষকে সে মানুষ বলে কোন দিন ভাবেনি তাই অবিশ্বাসও করেনি—তাই সর্বস্ব দিয়ে সে আজ হয়েছে ফকির—পথের কাঙ্গাল। তারই প্রজারা দিতে চাইলে তাকেই পুজো, তার ফলে তারা গেল জেলে, তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা আজ খেতে পায় না—"

ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

সুরমা দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইলেন, তাঁহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল অশ্রুধারা।

অতি কোমল কণ্ঠে ব্রজেশ্বর ডাকিল—"মা"

সুরমা চকিতে চোখ মুছিয়া মুখ তুলিলেন।

ব্রজেশ্বর তেমনই কোমলকণ্ঠে বলিল, "তুমি অনর্থক কাঁদছো মা, এ বংশ কোনদিন টিকতে পারবে না এ জানা কথা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভালো জিনিষ, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিতে যখন ছল চাতুরীর দরকার হয়, তখনই জানবে মা—ওর শেষ ফল রয়েছে ধ্বংস। আমি তোমার আঁচলের তলায়, তোমার বুকের মাঝে বড় আরামে ঘুমিয়ে ছিলেম মা, সে ঘুম আমার ভেঙ্গেছে। আমার রক্তে আগুন জ্বলেছে, আমার ঘুমন্ত শক্তির উদ্বোধন হয়েছে। এ শক্তি আজ দুর্ব্বার,—এ শক্তি প্রতিরোধ করতে আজ কেউ নেই, তুমি নেই—বাবা নেই, আছে কেবল জগৎ আর আছি আমি। যে ধ্বংসের আশঙ্কায় তুমি শিউরে উঠছো, বাবা শিউরে উঠছেন, ওই ধ্বংসের মধ্যে আমি দেখছি আনন্দ। ওর নেশা আছে বই কি মা,—সেই নেশায় মাতাল হয়ে আমি ছুটেছি, —শেষ পর্য্যন্ত আমি ছুটব। আমায় বাধা দিয়ো না—দিলেও সে বাধা আমি মানব না জেনো।"

সুরমা একটীও কথা বলিলেন না।

*

* *

পারমিতা অনেক করিয়া বলিল, কিন্তু জিতেন চৌধুরী অটল অচল।

পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া কলিকাতা যাইতে তিনি একেবারেই নারাজ। তিনি তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "তুই-ই বল দেখি মিতা, এ বাড়ী ছেড়ে একবার বার হলে আর কি এ বাড়ীতে ঢুকতে পারব? এই যে ভাঙ্গা বাড়ী, এর প্রতি ইটে কি মাখানো আছে জানিস্—আমার পিতৃপুরুষের স্মৃতি। যদিও কিছু নেই, তবু মনে হয় আমার সব আছে আমি কিছু হারাইনি। এই শ্মশানে দাঁড়িয়ে আমি তাদের ডেকে সাড়া পাই মিতা, যারা মরণের ওপারে চলে গেছে। ওই ভাঙ্গা ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকতে লোকে ভয় পায়, আমি ওর মধ্যে ঢুকি, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি, মনে হয় তারা এখনও আছে। একবার ডাকলে ছুটে আসবে—যদি তাদের তেমনিই করে ডাকি। একবার আমি বার হলে তারা চলে যাবে, ফিরে এসে ডাক দিলেও আর তাদের সাড়া পাব না মিতা—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর ভিজিয়া উঠিল।

পারমিতা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু এখানে ওই সব শত্রুর মধ্যে তোমায় রেখে গিয়েও যে আমি শান্তি পাবনা বাবা—"

"শত্রু—"

জিতেন চৌধুরীর হাসি আর থামেনা,—

"শত্রু তুই কাদের বলছিস মিতু? এমন কে আছে যে জিতেন চৌধুরীর দৈহিক অনিষ্ট করতে আসবে? আজ তো আমার কিছুই নেই মা, সব গিয়েও ঠাকুরবাড়ীর বালাই ছিল, দেবী নিজেই সে তর্কের

সমাধান করেছেন, কাজেই আমার আর ভাবনার কোন দরকার নেই। আর আমার থাকার মধ্যে আছে এইভাঙ্গা বাড়ীখানা, ওই বুড়ো পুরাণো চাকর ভোলা আর আছিস তুই। লোকে কি নিয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে আসবে মিতা, একটা কোন উদ্দেশ্য তো থাকা চাই।"

পারমিতা গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিল—

সে চোখে তখনই জ্বলিয়া উঠিল আগুন, কেহ বলিবে না যে একটু আগে চোখে জল ঝরিয়া পড়িয়াছে।

সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "লোকে তোমার জন্যেই তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে বাবা, আমার জন্যেও না, ভোলা বা ভাঙ্গাবাড়ী অধিকারের জন্যেও না। তোমার জীবনের পরে তাদের দৃষ্টি আছে, সে শ্যেনদৃষ্টি হতে আমি তোমায় রক্ষা করতে চাই বাবা।"

জিতেন চৌধুরী হাতের নল নামাইয়া এক পাশে রাখিয়া বলিলেন, "সে সম্বন্ধে তুই নিশ্চিন্ত থাক মিতা, আমার এই ভঙ্গুর দেহটার পরে যে কারও লোভ নেই একথা আমি জোর করে বলতে পারি। তুই অবনী রায় আর ব্রজেশ্বরকে লক্ষ্য করে এ কথা বলছিস্ তো? নিশ্চিন্ত থাক মিতা, ওরা আমার জীবনের অনিষ্ট করবে না তা আমি জানি।"

পারমিতা রাগ করিয়া বলিল, "ওই বিশ্বাসেই না তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা, মানুষকে অতখানি বিশ্বাস করেই না তুমি সব হারালে। মানুষ যে কি রকম খল তার পরিচয় কি আজও পাওনি বাবা?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিতেন চৌধুরী বলিলেন, "সত্যিই বড় দুঃখ হয় মিতু, মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারলে না, আস্তে আস্তে সে হয়ে পড়ল অতি নীচ। কেন এমন হোলো মিতা—মানুষ কেন এমন ভাবে ছলনা করতে শিখল বলতে পারিস্?"

পারমিতা বলিল, "তবু ভালো বাবা, মানুষের সম্বন্ধে এতটুকু ভাবতে শিখেছ। মানুষ আজই ছলনা চাতুরী শেখেনি, শিখেছে অনেককাল, তবে বর্ত্তমান সভ্যতার আইন বাঁচিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে সে কাজ করতে

শখেছে এইটুকুই মানুষের বুদ্ধি জ্ঞানের চরম দৃষ্টান্ত। হাঁ—মানুষকে বিচার করো বাবা, ওদের ভালো করে দেখে তবে বিশ্বাস করো। অবনী রায় বা তাঁর ছেলের কত বড় শত্রু তুমি, সেটা ভেবে দেখ। প্রজারা আজও তোমায় ভালবাসে সেইটাই তাঁরা সইতে না পেরে তোমার উচ্ছেদ সাধন করতেও পারেন, সেটা তো বিচিত্র নয় বাবা।"

জিতেন চৌধুরী স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

পারমিতা বলিতে লাগিল, "কত লোক তোমায় ভালোমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে কত জিনিষ যে নিয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই। আজ যখন জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, তাদের সেদিনকার তোষামোদ করাটা মনে কর দেখি বাবা। সেই তারাই আজ পথ চলতে যদি দেখা হয় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে—এমন ভাব দেখাবে যেন তোমার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। অথচ একদিন ওই লোকেই যখন তোমার কাছে এসেছিল বাবা—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে জিতেন চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন, "থাক থাক মিতা, মানুষ হয়ে মানুষকে অত খাটো করিস নে মা।"

পারমিতা শান্তকণ্ঠে বলিল, "খাটো যে ওরা আপনিই হয়েছে বাবা? বলে ওদের খাটো করতে হয়নি। মনে কর বাবা, অবনী রায় যখন তোমার বন্ধু হয়ে কাছে এসেছিলেন—"

জিতেন চৌধুরী বলিলেন, "থাম মিতা—যা হয়ে গেছে আর তা বলতে হবে না। এখনকারের জন্যে বরং আমায় জাগিয়ে তোল, আমার চোখে আর যেন ঘুম না আসে তারই চেষ্টা কর।"

পারমিতা বলিল, "সেই জন্যেই তো তোমায় এখান হতে নিয়ে যেতে চাই বাবা, তোমায় আমি এখানে রেখে যাব না।"

জিতেন চৌধুরী বলিলেন, কিন্তু সে জন্যেও তো আমার এখানে থাকা দরকার মিতা, মানুষকে চেনবার এমন জায়গা তো আমি আর পাব না। কেবল সে জন্যেই নয় মা, আমি এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না, যেতেও পারব না। দেখিসনি মিতা—এই বাড়ীর পেছনে বাগানে যেখানে তোর মাকে চিতায় শুইয়ে দিয়েছিলেম—নদী তার চিতাভস্ম ধুয়ে নিয়ে গেলেও সে চিতার দাগ যেন সেখানে আজও রয়েছে। রোজ আমি

সেখানে গিয়ে বসি, রোজ সেখানে বকুল ফুল ঝরে পড়ে। ঐখানে আরও কে ঘুমিয়ে আছে জানিস মিতা,—আমার স্নেহময়ী মা, আমার স্নেহশীল বাপ, আমার ভাই বোন সব। আমি ওদের এখানে ফেলে কোথায় যাব—সেই জন্যেই আমি কোথাও যেতে চাইনে, যাবও না।"

পারমিতা নীরবে জানালা পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

দূরে বাঁশ গাছের সরু আগাগুলো বাতাসে দুলিতেছিল, পাখীরা উড়িয়া যাইতে সেই দোদুল্যমান আগার উপর বসিয়া দোল খাইয়া যাইতেছিল। কানে আসিতেছিল সরু পাতা নড়ার সরসর শব্দ, পাখীর গান—কখনও কখনও ঝটপট পাখার শব্দ।

আকাশে মাঝে মাঝে টুকরা টুক্‌রা মেঘ ভাসিয়া আসিতেছিল, আবার তেমনই করিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

এমন তন্ময়তা আসিয়াছিল পিছনে কে কি বলিতেছে, কে কি করিতেছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে শুনিল ভোলা বলিতেছে—"ঠাকুরবাড়ীতে আমাদের ভশ্চায মশাইকে ঢুকতে দেয়নি, নিশিঠাকুর সমস্ত মন্দির জুড়ে বসেছে বাবু। ভশ্চায মশাই সাজি ভরে ফুল নিয়ে গিয়ে শেষে সব ফুল বারান্দায় ঢেলে চোখের জল ফেলে চলে এসেছেন।"

নিশ্চিন্তভাবে তামাক টানিতে টানিতে জিতেন চৌধুরী বলিলেন "তার জন্যে আমি কি করতে পারি ভোলা? ওদের মন্দির, ওদের দেবতা, ওরা যাকে দিয়ে খুসি পুজো করাবে, আমার তো আর কোন অধিকার নেই।"

পারমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল—

দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই আছে বাবা, অত সহজে আমি কখনও মন্দিরের অধিকার ছেড়ে দেব না।"

তাহার দুইটি চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু আমাদের ওতে কি অধিকার আছে মিতা—?"

পারমিতা তেমনই দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "আছে, কারণ দেবমন্দির ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বাবা, আমাদের মন্দির হলেও আমরা এ মন্দির ছেড়ে দিয়েছিলেম—সাধারণকে আমাদের নিজেদের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করিনি। আজ ওরা এখানে নিজেদের অধিকার প্রতিপন্ন করতে চাইলেই বা আমরা ছাড়ব কেন বাবা?"

জিতেন চৌধুরী বলিলেন, "আমরা আইনের দিকটা তো দেখিনি মা, দেখছি ধর্ম্মের দিকটা—"

অধীর ভাবে পারমিতা বলিল, "মানুষের তৈরী আইনই তো বাবা—"

বাধা দিয়া জিতেন চৌধুরী বলিলেন, "তবু তারই দাবী সকলের আগে মিতা! ধর্ম্ম যেখানে হয় অবহেলিত, মিথ্যা আইন সেখানে হয় সত্য এ দৃষ্টান্ত আজ নূতন নয় মা,—আইনের ক্ষমতা তো তুমিও দেখতে পাচ্ছো।"

পারমিতা নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিল।

*

* *

সত্যই ধ্বংসের মধ্যেও আছে আনন্দ, আছে নেশা।

ব্রজেশ্বর সেই নেশায় পাগল হইয়া গেছে।

সে শুনিয়াছে পারমিতা কলিকাতায় যাইবার সময় যে সব হতভাগ্য জেলে গিয়াছে তাহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করিয়া গিয়াছে।

মনটা কোমল হইয়া আসিয়াছিল, এই সংবাদ পাইয়া আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

কয়েকদিন আগে সে কৃষক-পল্লীর পথ দিয়া বেড়াইতে যাইতেছিল, সেই সময়েই দেখা হইল মতি মণ্ডলের বড় মেয়েটির সঙ্গে।

একটি শতছিন্ন কাপড় তাহার পরণে,—মাথার চুলগুলা অতি রুক্ষ কতকাল তৈল পড়ে নাই বলা যায় না।

সাত আট বৎসর তাহার বয়স, পথের ধারে একটা গাছতলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া সে ছোলা খাইতেছিল। মাঠের ছোলাগুলি এ সময়ে বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, মাঠেও কেহ নাই, নির্ব্বিচারে সে কতকগুলা তুলিয়া আনিয়াছে এবং পথের ধারে বসিয়াই সেগুলা নিঃশেষ করিতেছে।

চলিতে চলিতে ব্রজেশ্বর তাহারই সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি দৃকপাত করিল না, নিজের মনে যেমন খাইতেছিল তেমনই খাইয়া চলিল।

নিকটে আসিয়া ব্রজেশ্বর বেশ ভালো করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল। সামনে তাহাকে দেখিয়াও মেয়েটী একটু সঙ্কুচিত হইল না বা উঠিলও না। গরীব ও ধনী লোকদের সে চিনে, সঙ্কুচিত হইত যদি কৃষক কাহাকেও দেখা যাইত। বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ যে পরে, হাতে যাহার আংটি থাকে—পায়ে জুতা থাকে, তাহারা যে মাঠের কাজ করে না, সুতরাং মাঠও তাহাদের নয় ইহা সে বেশ ভালো রকমই জানে।

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাচ্ছো খুকি ?"

খুকির মুখে তখন অনেকগুলি ছোলা,—

চিবাইতে চিবাইতে গম্ভীর ভাবে সে বলিল, "কি খাচ্ছি তা দেখতে পাচ্ছো না—কানা নাকি ?"

ব্রজেশ্বরের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এই সব মেয়েদের, ইহাদের সন্তানদেরই মানুষ করিয়া তুলিতে চায় পারমিতা। সংস্কার যাহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মানুষ করা কি সোজা কথা ? ইহাদের মানুষ করিতে গেলে আগে ইহাদের রক্তমোক্ষণ করা দরকার; বংশের রক্ত মোক্ষণ করিয়া ওসব দেহে রক্ত দিবে কে ?

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাঁচা ছোলা খাচ্ছো, অসুখ হবে যে—ফেলে দাও ও-গুলো।"

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল।

"আজকে ভাত খাইনি বাবু, ক্ষিধে পেয়েছিল, মার কাছে ভাত চাইলুম—মা খেতে দিলে না, বললে ভাত নেই।"

"ভাত নেই—তোমার মা বললে—?"

কিন্তু প্রশ্ন ও বিস্ময় অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সমাধানও হইয়া গেল। ভাত সকল মায়ে সকল সন্তানের কোলের কাছে ধরিয়া দিতে পারে না। দিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময় কন্যাকে, স্ত্রীকে দেবীর মত দেখিতে পাইলেও আমরা কোন কোন সময়ে জননীকে অন্য ভাবে অন্য মুর্ত্তিতে দেখিতে পাই। ব্রজেশ্বরের মা পুত্রের সামনে বিবিধ উপচার সহ ভাত দিতে পারেন, এই মেয়েটীর মা পারে না।

ব্রজেশ্বর খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার নাম কি খুকি—তোমার বাবা কোথায়?

মেয়েটী ছোলা চিবাইতে চিবাইতে অবহেলার সঙ্গেই উত্তর দিল. "আমার বাবার নাম মতি মণ্ডল, বাবা জেলে গেছে।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "জমিদার বাবাকে জেলে দিয়াছে কিনা, আমরা কেউ কোন কথাই তাই বলতে পারিনি, মা চুপ করে কেবল কাঁদে, আর কি করবে?"

মতি মণ্ডল—জমিদার—

ব্রজেশ্বরের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, আর একবার মেয়েটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া সে সেস্থান ত্যাগ করিল।

মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, কয়জনের এ রকম অবস্থা হইয়াছে। যাহারা জেলে গিয়াছে তাহারা কেহ কৃষক, চাষ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে, কেহ শ্রমজীবী, দৈনিক উপার্জ্জনে তাহাদের ক্ষুধার আহার্য্য সংগ্রহ করে।

তাহাদের পরিবারবর্গের আজ কি অবস্থা।

ওই রকমই কত মা তাহাদের সন্তানদের আহার দিতে পারে নাই,

সেই সব হতভাগ্য সন্তানেরা অমনি করিয়াই যেখান সেখান হইতে যেমন তেমন আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। উহাদের মাথা রুক্ষ, পরণে বস্ত্র নাই, সে ক্রটী মোটেই চোখে পড়ে না—যত অনুভব হয় আহার্য্যের অভাব।

ব্রজেশ্বর ফিরিল—

এ পথ বাহিয়া চলা তাহার পক্ষে আর সম্ভব নহে। এমন কত দৃশ্য চোখে পড়িবে, হয় তো ইহাপেক্ষা আরও ভীষণ—আরও ভয়াবহ।

দরকার নাই আর দেখিয়া, মন খারাপ করিয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়াই ভালো।

ফাঁকা ময়দানে আসিয়া সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কৃষক-পল্লীতে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

একবার সে চারিদিকে তাকাইল।

এই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ইহার চারিধারে অতি দূরে গ্রামের গাছপালা দেখা যায়, মাঝে মাঝে দুই একখানা পর্ণকুটীরও চোখে পড়ে। চৌধুরী-বংশের জমিদারি, উহারা সকলেই প্রায় জিতেন চৌধুরীর প্রজা ছিল, আজ সব ব্রজেশ্বরের পিতার। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে বার আনা অধিকার সে পাইয়াছে, ইহার পর ষোল আনার অধীশ্বর হইবে সে।

কিন্তু কোথায় আনন্দ?

মনে করিতেও বিষাদে, দুঃখে হৃদয় ছাইয়া যায়।

কি দরকার ছিল এমনভাবে জমিদারি নেওয়ার—নাম করার? সামান্য থাকাই ভালো, বড় হওয়া ভালো নয় বলিয়াই ব্রজেশ্বরের ধারণা।

এ সব কিছু কি থাকিবে?

কুসংস্কার—ব্রজেশ্বর মুখে তাহাই বলে, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থানে যে থাকে সে ইহাই মানিয়া লয়। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সেখানে তাহার অজ্ঞাতেই নিক্তি ধরিয়া লইয়া যায়।

"ছোটবাবু যে, মাঠ দেখতে এসেছেন বুঝি—দণ্ডবৎ হই—"

পিছন হইতে সনাতন সরকার কথাটা বলিয়া সামনে আসিয়া প্রণাম করিল।—

এও ছিল জিতেন চৌধুরীর প্রজা এবং গোমস্তা, উপস্থিত ব্রজেশ্বরের পিতার অধীনে সেই গোমস্তারই কাজ করিতেছে।

ব্রজেশ্বর শুধু হাসিয়া বলিল, "বেড়াতে বার হয়েছি। তুমি চলেছ কোথায় ?"

হাতের খাতাখানা দেখাইয়া সনাতন উত্তর দিল, "এই যে, আদায় করতে বার হয়েছি ছোটবাবু। গত সনের খাজনা বাকি, সেগুলা আজ আদায় করতেই হবে। ত্ব'জন পাইককে পাঠিয়েছি। আরও ত্ব'জন আসছে, দেখি এদের চারজনকে দেখে ভয়ে যদি খাজনাটা দেয়। এমন ছোটলোক সব ছোটবাবু, কিছুতেই যদি খাজনা দেয়। কেউ ঘুরাচ্ছে আজ নয় কাল বলে—কেউ বা সোজা জবাব দিয়েছে—খাজনা দিতে হয় জিতেন চৌধুরীকে ছাড়া আর কাউকে দেব না। শুন্থন আস্পর্দ্ধার কথা একবার—।"

বলিতে বলিতে সে হাসিতে লাগিল—

"আরে—চৌধুরী মশাই এখন নিজেই খেতে পায় না এমনি তো হয়েছে অবস্থা। জানলেন ছোটবাবু, মেয়েকে যে টাকা পাঠাতেন পড়ার জন্যে—সে টাকা পাঠানোও বন্ধ করতে হয়েছে।"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি পড়ার খরচ পাচ্ছেন কোথায় ?"

সনাতন হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে কথা উনি না বলতে চান, আর কেউ না জানুক—সনাতন সরকার ঠিক জানে ছোটবাবু।—সে মেয়ে নিজে নাকি কোথায়-কোথায় পড়ায়, পড়িয়ে যে টাকা পায় তাতে তো নিজের সব খরচ কোনরকমে চালাচ্ছেই তা ছাড়া ওর বাপেরও অনেক খরচ চালিয়ে দিচ্ছে।"

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "জানেন ছোটবাবু, সেদিনে জিতেন চৌধুরীর নামে একটা পার্শ্বেল এসেছিল, সেটা দিতে আমাদের হরেনই গিয়েছিল, সে এ গাঁয়ের পিয়ন—আমার সম্বন্ধী হয়। বিশ্বাস করুন ছোটবাবু, সেই পার্শ্বেলের মধ্যে ছিল ছয়টা মদের বোতল—"

বলিতে বলিতে সে শিহরিয়া উঠিল—

ভাবুন, একবার, মেয়ে তার বাপকে পাঠিয়েছে মদ, সে মদ খেয়ে তার বাবা মাতলামি করবে। শুনেছি—সে নাকি নিজের হাতে জিতেন চৌধুরীকে মদ ঢেলে দিত খাওয়ার জন্যে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, অধঃপতন আর কাকে বলে? এ সব কাজ পরিবারেই পারে না বাবু, মেয়ে হয়ে সে কিনা তাই করলে। ওই জন্যেই তো বাবু মেয়েটাকে লেখাপড়া করতে দেইনি এমনি থাক আকাট মূর্খ হয়ে, তাও ভালো। লেখাপড়া শিখে কোন্‌দিন সেও অমনি করে মদ পাঠাতো, হাতে করে ঢেলে দিতো।

লেখাপড়া শেখার গলায় দড়ি। যে লেখাপড়া কোন ভালো কাজে লাগে না, সে রকম লেখাপড়া না শেখাই ভালো। শুনেছি সহরে নাকি মেয়েরা অনেক বেশী লেখাপড়া শেখে, তারা কি আর মানুষ থাকে ছোটবাবু, তারা হয় একেবারে বদ, নরকের পেত্নী। ওই সব লেখাপড়া-জানা-মেয়েরা না পারে এমন কাজই নেই।”

অসহিষ্ণুভাবে ব্রজেশ্বর বলিল, “থাক থাক, পরের চর্চ্চা আর নাই বা করলে সনাতন? তুমি তো মেয়েকে লেখাপড়া শিখাচ্ছ না বা তুমি মদও খাও না যে তোমার মেয়ে লেখাপড়া শিখে তোমায় মদ ঢেলে দেবে।”

মুখ বিকৃত করিয়া সনাতন বলিল, “রামচন্দ্র।”

অসহিষ্ণুভাবে ব্রজেশ্বর বলিল, “তুমি কি মদ খাও নাকি সরকার?”

জিহ্বা দংশন করিয়া সনাতন বলিল, “ও কথা মুখেও আনবেন না ছোটবাবু, আমরা জাত বোষ্টম, আমাদের ওসব খেতে দেখাও মহাপাপ।

ব্রজেশ্বর মুহুর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিল, “তোমার কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে না সরকার, বেলা যে প্রায় শেষ হয়ে এলো—”

কর্ত্তব্যচ্যুতির ত্রুটিতে হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিয়া সনাতন বিবর্ণমুখে বলিল, “তা হল বটে,—এই যে আমি যাচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে ছোটবাবু, এতক্ষণই হয়ে যেত, নেহাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিনা—”

সে দুই পা অগ্রসর হইল—

ব্রজেশ্বর ডাকিয়া বলিল, "একটা কথা শুনো সরকার, ওদের ওপরে যেন জোর জুলুম না হয়। ভয় দেখিয়ে যদি পারো খাজনা আদায় করো, তাই বলে যাতে সত্যিই ভয় হয় এ রকম কোন কাজ যেন করো না।"

বিনীত হাসিতে মুখ রঞ্জিত করিরা সনাতন বলিল, "তাই কি করতে পারি ছোটবাবু, সে খেয়াল আমারও খুব আছে। যেটুকু ভয় দেখাই সে শুধু আপনাদেরই জন্যে বাবু আপনাদেরই খাজনা আদায় করবার জন্যে; নইলে আমারই বা কি বলুন। যাদের ভয় দেখাব তারা তো আমাদেরই আত্মীয়স্বজন; তাদের স্ত্রী কন্যা আর আমাদের স্ত্রী কন্যা তো তফাৎ নয়।"

সে চলিয়া গেল কিন্তু যে কথাগুলা নেহাৎ সাদাসিধা ভাবে সে বলিয়া গেল, সেই কথাগুলাই অত্যন্ত জটিলভাবে অত্যন্ত বড় হইয়া ব্রজেশ্বরের বুকে আঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

তাহারা সনাতনেরই স্ত্রী কন্যা, ব্রজেশ্বরের কি কেহ নয়?

তাহারা ব্রজেশ্বরের মাতৃজাতির অন্তর্গত, ব্রজেশ্বরের মা আর তাহারা ভিন্ন নয়। ওই সব পুরুষ যাহারা দিন আনে দিন খায়, তাহারা ব্রজেশ্বরের প্রজা, তাহার ভাই তাহার পুত্র।

ব্রজেশ্বর অন্যমনস্কভাবে দূরের পানে তাকাইয়া রহিল।

সে ধনী, সে প্রাসাদে বাস করে, তাহার আদেশে সহস্র লোক ছুটিয়া যায়, তবু সে আর ওই পর্ণকুটীরে বাস করে যে কৃষক সে এক, পার্থক্য তাহাদের মধ্যে কই?

সেও যে মানুষ, ওই সব দরিদ্ররাও সেই মানুষ। তাহারই মত তাহারা যেদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল সেদিন পর্ণকুঠিরে বিশেষ কোনও উৎসব না হোক, শাক বাজিয়াছিল, উলুও পড়িয়াছিল' পিতা-মাতার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যদিও তাহারা বেশই জানিত তাহাদের সন্তান তাহাদেরই বংশের ধারায় চলিবে ---তাহাদের চিরাচরিত কার্য্যই করিবে। তাহাদের সন্তান কোনদিন

জজ্ হইবে না, ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে না, এমন কি দারোগার মুহুরীও হইবে না।

সে মানুষ হইয়াই জন্মিয়াছিল এবং পৃথিবীও পরম আদরে তাহাকে গ্রহণ করিরাছিল। দেয় নাই কি ?

ব্রজেশ্বর যেমন পিতামাতার আদর পাইয়াছে তাহারাও তেমনই আদর পাইয়াছে, ব্রজেশ্বরের মতই তাহারা আহার্য্য পাইয়াছে, তৃষ্ণায় জল পাইয়াছে, পায় নাই কি ?

পায় নাই কেবল ধনীর মর্য্যাদা, ধনীর সমাধিকার ; তাই তাহারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইয়া আজ বরণ করিয়া লইল কারাগার, আর ব্রজেশ্বর সদর্পে সগর্ব্বে বাহিরে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

*

* *

সুরমা চুপ করিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

পূর্ব্বের আকাশের কোলে যে আরক্তিম রাগ দেখা যাইতেছে উহা রাত্রের চন্দ্রোদয়ে নয়, দূর গ্রামে কোথায় আগুন লাগিয়াছে, তাহারই শিখা আকাশের দিকে উঠিয়াছে ও আরক্তিম রাগ তাহারই।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

চারিদিক এখন নিস্তব্ধ বলিয়াই দূর গ্রামবক্ষে যে কোলাহল উঠিয়াছিল তাহার অস্পষ্ট আওয়াজটা ময়দানের উপর দিয়া এতদূরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল।

সুরমা দুই হাতে জানালার রেলিং ধরিয়া তাকাইয়া ছিলেন ?

হতভাগ্য গ্রামবাসীদের গৃহ পুড়িয়া যাইতেছে, কেহ কি নাই উহাদের রক্ষা করিতে ছুটিবে ? এ কোলাহল বাহিরেও আসিয়া

পৌঁছাইয়াছে, ওই অগ্নিশিখা বাহিরের লোকও দেখিয়াছে, কই তাহারা তো ছুটিয়া গেল না ?

জমিদারের কাজ কি শুধু খাজনা লইয়া— প্রজাদের আপদ বিপদে তিনি কি সাহায্য করিবেন না। তিনি কি তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিবেন না ?

পুর্ব্বাচারিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন একা জিতেন চৌধুরী। প্রজাদের যখনই যে কোন বিপদ হোক, যেমন করিয়াই হোক তিনি তাহাদের দেখিতেন, তাহাদের সাহায্য করিতেন। আর অবনী রায়—তাঁহার স্বামী—?

সুরমা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিলেন। অন্তঃপুরের পর্দ্দা দূর করিয়া যদি তিনি একবার যাইতে পারিতেন—? কিছু করিতে পারুন বা নাই পারুন, তবু চেষ্টা তো করিতেন।

ব্রজেশ্বর পিছনের বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইবার সময় একবার দেখিয়া গেল মা কি করিতেছেন, তাহার মৃদু পদশব্দ সুরমার কাণে আসে নাই ?

ঘণ্টাখানেক আকাশ হইয়া রহিল সিন্দুরের মত লাল, গোলমালও রহিল অতি সুস্পষ্ট। সে তো একটীমাত্র কণ্ঠস্বর নয়, মোটা সরু অনেকগুলি স্বর মিলিয়া কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এইরূপ কোলাহলই আকাশ ভেদ করিয়া অতি উর্দ্ধে পৌঁছাইতে পারে, অতি সহজে সেই একমাত্র বিচারকর্ত্তার চরণে নিঃশেষিত হইয়া মিলাইয়া যাইতে পারে।

সুরমা একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াছিলেন, বজ্রকণ্ঠে মিশ্রিত কণ্ঠে কত কি কথা উচ্চারিত হইতেছিল, যদিও কিছু বোঝা যায় না, তবুও জানা যায় তাহারা চাহিতেছে সাহায্য।

সাহায্য চায়—কাহার কাছে ?

নিদ্রিত দেবতা, জাগো, জাগো প্রভু, প্রপীড়িতের জন্য আছ তুমি, আর তো কেহই নাই প্রভু। ওগো শাসনকর্ত্তা, তোমার ন্যায়দণ্ড কই —কোথায় রহিয়াছ প্রভু ?

আকাশের কোলে ঘন লাল রেখা আস্তে আস্তে মিলাইয়া আসিতেছিল, কোলাহলও ঝিমাইয়া পড়িল—

সুরমা তখনও সেখানে সেই একভাবে দাঁড়াইয়া।

ঘণ্টাখানেক পরে আকাশের বুকের আলো-রেখা মিলাইয়া আসিলে, কোলাহলও কমিতে কমিতে মিলাইয়া গেল।

তখনও সুরমা সেখানে দাঁড়াইয়া।

কত গৃহ পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল, কত লোক যথাসর্ব্বস্ব হারাইল কে তাহার হিসাব করিয়া দেখিবে? আজ এই সমস্তরাত্রি সেই সব হতভাগ্যেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া অনাবৃত স্থানে বসিয়া থাকিবে, কোনক্রমে রাত্রিটাকে কাটাইয়া দেওয়া চাই। কিন্তু কাল প্রভাত যখন আসিবে, তাহার আলোয় কি দৃশ্য চোখে পড়িবে—?

তাহার পর মনে পড়িবে খাওয়ার চিন্তা—

ছেলে মেয়েরা আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিবে, পিতা-মাতা কি করিয়া সহ্য করিবে?

তাহারা ডাকিবে শুধু ভগবানকে, কিন্তু ভগবান যে কিছুই করিতে পারিবেন না তাহা তাহারা বেশই জানে। ভগবান যে মানুষটীর অন্তরে নিজেকে বিকশিত করিয়াছিলেন, উহাদের—ওই সব হতভাগ্যদের নিতান্ত আপনার সে লোকটী আজ সব হারাইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে।

সন্ন্যাসী? হাঁ, সে আজ সন্ন্যাসী। সে আজ সর্ব্বত্যাগী—তাহার কিছু নাই। আজও তাহাকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইতে হয় নাই, সামান্য আহার্য্যে উদর পূর্ণ করিয়া ভাঙ্গা বাড়ীটার আচ্ছাদনের নীচে তবু সে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

আজও আছে মাথার আচ্ছাদন সেই ঘরখানা—দু'দিন বাদে তাহাও যাইবে; পরে যাহা কিছু আসবাব পত্র আছে সবই চাপা পড়িয়া যাইবে, রাবিশ ঠেলিয়া সে সব জিনিষ বাহির করিতে কেহই আসিবে না।

"মা- -"

ব্রজেশ্বরের আহ্বানে মা ফিরিয়া চাহিলেন।

ব্রজেশ্বর বলিল, ওখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কি করছো মা? প্রায় দেড়ঘণ্টা আগে আমি এইখান দিয়ে যাওয়ায় সময় দেখেছি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ, এখনও দেখছি ঠিক তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে। কি করছো মা—কি দেখছো?"

সুরমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

হয় তো তাঁহার মনের এক কোণে এতটুকু আশা জাগিয়াছিল অবনী রায় ওই হতভাগ্যদের রক্ষা করিতে না ছুটিলেও তাঁহার পুত্র গিয়াছে। একবার তাহার দেহের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া দেখিলেন এতটুকু অসংযত বেশভূষা নয়—চঞ্চলতাও তাহার মধ্যে নাই।

ফিরিয়া আসিয়া চৌকির উপর বসিয়া তিনি বলিলেন, "আগুন দেখছিলেম ব্রজ।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "উঃ, সেই আটটা হতে এই সাড়ে-দশটা পর্য্যন্ত তুমি একভাবে এখানে দাঁড়িয়ে শুধু ওই লাল আকাশটা দেখছিলে মা?"

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরমা বলিলেন, "কেবল লাল আকাশের রূপই দেখিনি ব্রজ কাণে শুনছিলেম ওই সব হতভাগাদের চীৎকার, বুকফাটা কান্না; কল্পনা করছিলেম আজ যাদের ঘর পুড়ল, রাতটা যেখানে সেখানে কাটিয়ে দিয়ে সকালে তারা দেখবে কি, যাবে কোথায়?"

অবহেলার ভাবে ব্রজেশ্বর বলিল, "সেজন্য তোমার আমার ভাববার কোন দরকার নেই মা। ওদের পিয়ারের ভগবান আছেন, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন, সে বিশ্বাস ওদের আছে।"

সুরমা নীরবে পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া ব্রজেশ্বর মুখ ফিরাইল।

বলিল, "বুঝেছি, ওদের দুঃখে তোমার প্রাণ কেঁদেছে, কিন্তু কেনই বা কাঁদবে মা, কেনই বা তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

সুরমা ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "মনে যেন একটু আশা হয়েছিল, আমার ছেলে ওদের সাহায্য করতে গেছে।"

ব্রজেশ্বর হাসিল—

"ক্ষেপেছ মা—আমি যাব ওদের—ওই সব লোকদের সাহায্য করতে? যাদের ঘর বাড়ী আজ জ্বলে উঠল আমাদেরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে, প্রকাশ্যে তাদের বাঁচাতে যাওয়ার অভিনয়টুকুতে আমার কি দরকার?"

"তোদেরই ইঙ্গিতে—তুই বলছিস কি ব্রজ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তাই বই কি মা? ওরা খাজনা দেয়নি—দেবেও না, তাই জমিদারের লোক কোন চিহ্ন না রেখে ওদের ঘরে আগুন দিয়েছে,—সন্ধ্যার অন্ধকার ওদের আইন হতে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। তাই তো বলছি মা—মানুষ দূরে যাক, ওদের ভগবানকে ডেকেই বা ওরা কি করবে, তিনিও যে ওদের বিপক্ষে। যাক মা ওসব নিয়ে ভাববার দরকার আমাদের নেই,—সামনে গিয়ে নাম কুড়ানোর প্রত্যাশী আমি নই—তাই আমি যাইনি।"

সুরমা মুহূর্ত্তে যেন পাষাণে পরিণত হইয়াছেন।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কিন্তু ওদের জন্যে এতটুকু দুঃখ পাওয়াও উচিত নয়। দেখ ওরা আজকালই নয়, যুগে যুগে এমনই দরিদ্র হয়ে কুঁড়ে ঘরে জন্মাচ্ছে, এমনই করে পীড়ন সইছে নিজেদের জিদ বজায় রাখতে গিয়ে। কেন ওরা বড় ঘরে জন্মায়নি সে অপরাধ ওদের; কেন ওরা গরীব হয়েও নিজেদের জিদ বজায় রাখতে এ রকম করে সে দোষও তাদের। ওরা সয়েছে, আজও সইছে চিরকাল সইবেও, সেইজন্যে সেই দুঃখ সইবার জন্যে আর ওরা এতটুকু বেদনাও অনুভব করে না। একেবারে যারা জড় হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে জীবনের বিকাশ বা চেতনা আনা যায় না মা। ওরা অন্ধ, ওরা বধির, ওদের বুক হয়ে গেছে পাথর সে পাথরে কোন দাগই বসে না। আজ ওরা বেদনা পাক, যাতনা পাক, তার প্রতিবিধানের উপায় জানা থাকলেও তা করবে না। তুমি কি ভাবো ওদের জানানোর জন্যে কেউ কোন চেষ্টা করেনি? ঢেরই চেষ্টা হয়েছে মা বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তুলবার, কিন্তু হয়নি মা—কিছুই পারা

যায়নি। ওরা অচল-গিরি হিমালয়ের মত পড়ে আছে, যুগে যুগে কত আসে কত যায়, ওরা শুধু চেয়েই থাকে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মুখ ফিরাইল।

সুরমা তাহার পানে তাকাইলেন, শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওদের জন্যে—ওই সব পতিতদের তুলবার জন্যে কেই বা চেষ্টা করেছে ব্রজ?"

দৃপ্তকণ্ঠে ব্রজেশ্বর বলিল, "কেই বা করে নি মা? মনে কর যুগে যুগে কত মহাপুরুষই আবির্ভূত হয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম আজও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। তারপর যদি সে যুগ ছেড়ে বর্ত্তমান যুগে চোখ ফিরাই মা—অনেক লোককেই দেখতে পাই; গান্ধিজী হতে আরম্ভ করে আমাদের জিতেন চৌধুরী পর্য্যন্ত সেই সব সংস্কারকের দলভুক্ত দেখা যায়। জিতেন চৌধুরী এদের জন্যে তো কম চেষ্টা করেন নি মা; নিজের অসীম সম্পত্তি,—সবই তো ঘুচালেন ওই সব হতভাগাদের ভালোর জন্যেই। কোথায় ওরা হাঁটতে কষ্ট পায়, করে দিলেন পথ, কোথায় নদীপথে চলতে ব্রীজ, কোথায় ঘর তুলে দেওয়া, দাতব্য চিকিৎসালয় করে দেওয়া—কোন্ কাজটা না তিনি করেছেন বল দেখি?"

ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া সুরমা বলিলেন, "কিন্তু আসল কাজ ওদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা—"

বাধা দিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সত্যি সেইটাই ছিল আসল কাজ—কেন না ক্ষেত্র উপযুক্ত তৈরী না হওয়ায় যত সারবান বীজ দেওয়া হয়েছিল সবই গেল শুকিয়ে। এই সব প্রজারা তাঁর দেওয়া জিনিস দু'হাত দিয়ে কুড়িয়ে নিলে, তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক—তারা বললে এ তাদের প্রাপ্য—চির প্রাপ্য। তারা জানে—ভগবান এ দিতেনই, জিতেন চৌধুরী উপলক্ষ্য মাত্র। আজ জিতেন চৌধুরী যদি নাও থাকতেন, অন্য যে কেউ ভগবানের এ দান বয়ে আনত। তাই তো বলি মা—আজকের অগ্নিকাণ্ডও ওরা ভগবানের দেওয়া বলে মেনে নিক্—ভগবান বাঁচাবে বলেই ভাবুক। আমরা কেন যাব? ওই সব জ্ঞানপাপীদের বুঝাতে পারব না, জ্ঞান দিলেও ওরা নিতে চাইবে না,

তবে কেন ওদের পেছনে খেটে নিজের শক্তি ক্ষয় করে ফেলি ? ওরা থাক —যেমন আছে তেমনই থাক। এই যে পারমিতা এখানে এসে ওদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, নিজে ভার নিলে, ওরা কি করলে জানো ? তার মুখের পরে এমন ভাবে হেসে উঠলো যাতে পারমিতার সারা মুখ লাল হয়ে উঠলো, সে ফিরে আসতে বাধ্য হল।”

ব্যগ্রভাবে মাতা জিজ্ঞেস করিলেন, “ওদের জাগাতে পারমিতাও চেষ্টা করেছিল—সফল হয়নি।”

ব্রজেশ্বর হাসিল, বলিল, “কেউ কোন দিন যা পারেনি, আজ পারমিতাই কি পারবে মা ? পারমিতার সকল চেষ্টা তাই ব্যর্থ হয়ে গেছে, পারমিতাকে তাই তৈরী পথ ছেড়ে সরে আসতে হয়েছে।”

সুরমা জিজ্ঞাসুনেত্রে পুত্রের পানে চাহিলেন।

ব্রজেশ্বর একটু হাসিল, বলিল, কত বড় বড় মহাপুরুষ তল হয়ে গেছেন মা, তাঁদের তুলনায় পারমিতা ? সামান্য একটী মেয়ে—”

“বাধা দিয়া সুরমা বলিলেন, সামান্য একটী মেয়ে বলিসনি ব্রজ, তার পরিচয় তুই পাসনি তাই তাকে সামান্য মেয়ে বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিস। যদি তার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতিস তাহলে বুঝতে পারতিস সে কত বড়—কত উঁচু, কতখানি ক্ষমতা তার আছে। সে পারতো যদি সে আর কারও সাহায্য পেতো। একা মেয়ে সে—যত শক্তিই তার থাক না কেন, সাহায্য না পেলে তাকে নীচু হয়ে পড়তেই হবে, তাকে ব্যর্থ হতেই হবে যে।”

সুরমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

*

* *

জিতেন চৌধুরী আগুন নিভাইতে গিয়া সাংঘাতিক রকম দগ্ধ হইয়াছেন কথাটা গ্রামে ভোর না হইতেই ছড়াইয়া পড়িল।

দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া সুরমা ব্রজেশ্বরের সন্ধানে ছুটিলেন।

কেবলমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া সে উঠিয়া বসিয়াছে, সুরমা প্রবেশ করিয়াই আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, “একবার যা ব্রজ, চৌধুরী মশাই হয় তো বাঁচবেন না, একটীবার সকল শত্রুতা ভুলে তাঁকে দেখে আয়।”

ব্রজেশ্বর যেন আকাশ হইতে পড়িল,—

"কে মা, কার কথা বলছো—কে বাঁচবে না ?"

সুরমা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "চৌধুরী মশাই, জিতেন চৌধুরী—"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল সন্ধ্যার পরও যে তাঁকে দেখে এলেম মা, বরাবর নদীর ধার দিয়ে চলছিলেন। আমার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললেন, প্রজাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে—"

সুরমা বলিলেন, "যে প্রজাদের হারিয়েও তিনি আজও প্রাণের অধিক ভালোবাসেন, সেই প্রজাদেরই ঘরে আগুন লাগায় তিনি নাকি আগুন নিভাতে গিয়েছিলেন। তোরা জোয়ান ছেলে হয়ে যাসনি ব্রজ, তিনি অত বুড়ো আর অক্ষম দুর্ব্বল হলেও ছুটে গিয়েছিলেন। একখানা ঘর হতে একটী শিশুকে টেনে বার করবার সময় জ্বলন্ত চালা তাঁর 'পরে এসে পড়েছিল "

ব্রজেশ্বর আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ—"

সুরমা বলিলেন, "তাঁকে কোনো রকমে তাঁর বাড়ীতে এনে ফেলা হয়েছে। বেচারা ভোলাই বা কি করবে, সেও তো অক্ষম দুর্ব্বল তুই যদি এ সময়টা একবার যাস ব্রজ "

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "ওঁর কথা তো বলা যায় না, ওঁকে বলাও যায় না,—কিন্তু তোকে অসঙ্কোচে বলতে পারি ব্রজ, কেবল সেই জন্যেই বলছি। আমি বলছি ব্রজ, এতে তোদের মান সম্ভ্রম বা বংশমর্য্যাদার এতটুকু হানি হবে না। মনুষ্যত্বের বর্ম্মে ঠেকে সবই গুঁড়িয়ে যায়, কেবল আমার এই কথাটাই মনে রাখিস।"

ব্রজেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ে জামা দিতে দিতে শুষ্ক হাসিয়া বলিল "তোমার শিক্ষাই তো আমার মূলে রয়েছে মা, আজ আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। বাবার 'পরে অভিমান দেখাতে গিয়ে আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি এ কথাটা আজ যেমন ভাবে বুঝতে পারলেম মা, আশীর্ব্বাদ কর—আমি যেন নিজের মনুষ্যত্ব বজায় রেখেই চলতে পারি; সে বর্ম্মে ঠেকে আমার বংশগৌরব আমার মানসম্ভ্রম গুঁড়ো হয়ে যাক।"

সে বাহির হইয়া গেল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায় সুরমা তাকাইয়া রহিলেন—।

এই তাঁহার পুত্র—তাঁহার ব্রজ—চির আদরের ব্রজেশ্বর। এতদিন কোথায় সরিয়া গিয়াছিল সে—মা হাত বাড়াইয়া সন্তানের নাগাল পান নাই। স্বামীর বংশগৌরব, স্বামীর পদমর্য্যাদা তাঁহার নিকট হইতে ব্রজকে তফাৎ করিয়া দিয়াছিল। আজ আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে, মায়ের কোলে সে স্থান পাইয়াছে, মাতা পুত্রের মাঝখানে আজ বংশ-মর্য্যাদা নাই, পদমর্য্যাদা নাই, সংসার নাই এমন কি অবনী রায়ও নাই।

কত রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়া গিয়াছে, ওই জানালার ধারটীতে বসিয়া দেয়ালে মাথা রাখিয়া জমাটবাঁধা অন্ধকারের পানে তাকাইয়া সুরমা কত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছেন।

মাতা ও সন্তান—নারীত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, নারীর জীবনের একমাত্র কামনা পূর্ণ হয় সন্তানের মধ্যে। নারী স্নেহের সাগরে ডুব দিয়া সব হারাইয়া ফেলে—সংসার, সমাজ, এমন কি নিজের সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ কিছুই তাহার জ্ঞান থাকে না। তখন মনে হয় সে মা, সে স্ত্রী নহে, কন্যা নহে, সে শুধু মা—কেবল মা।

তাই সন্তান হারাইয়া মা হয় উন্মাদিনী, জগৎ তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। সুরমা সেই সন্তানকে হারাইয়াছিলেন—আজ সেই সন্তান ফিরিয়া পাইয়াছেন—এ আনন্দ তাঁহার রাখিবার স্থান কোথায়?

অবনী রায় বাহিরে যাইতেছিলেন, সুরমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পত্নীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, "ব্রজকে কোথায় পাঠালে শুনি—?"

সুরমা উত্তর দিলেন, "জিতেন চৌধুরীকে একবার দেখে আসতে।"

অবনী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ তাঁর 'পরে এত দয়া হওয়ার মানে—?"

সুরমা উত্তর না দিয়া ফিরিলেন।

অবনী রায় বলিলেন, "সে বেচারাকে না দিলে একটু চা খেতে,

না দিলে মুখটা ধুতে, বিছানা হতে উঠিয়েই জিতেন চৌধুরীকে দেখতে পাঠানোর মানে তো বুঝলেম না।"

সুরমা বলিলেন, "মানে জিতেন চৌধুরী কাল রাত্রে আগুন নিভাতে গিয়ে পুড়ে গেছেন, যদি কোনও দরকার পড়ে সেই জন্যে ওকে দেখতে পাঠালাম।"

"পুড়ে গেছেন—জিতেন চৌধুরী--?"

অবনী রায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

সুরমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ সময় মনুষ্যত্ব দেখানো উচিত; যে রকমের শত্রুই হোক, তার শত্রুতা মনে রাখার সময় এটা নয়। সে তার কর্ত্তব্য ভুলে গিয়েছিল, সেইজন্যে তার কর্ত্তব্য পালন করতে তাকে পাঠিয়েছি, আমায় ক্ষমা করো আমার এ অনধিকার কাজ করবার জন্যে। এতদিন পর্য্যন্ত তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, আজ আর পারলেম না। কতদিন সে আগেকার মতই "মা" বলে ডেকে এসেছে, তবু তাকে নিতে পারিনি কেবল প্রতিজ্ঞা পালন করবার জন্যেই। আজ আর পারলেম না, নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে তাকে বিছানা হতে উঠিয়ে তোমার সেই চির শত্রুকেই দেখতে পাঠিয়েছি।

"চির শত্রু—"

অবনী রায় আরও কি বলিতেন, কিন্তু আর একটীও কথা তাঁহার মুখে ফুটিল না।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতে আমার অপরাধ হয়েছে? কিন্তু আজ অপরাধ হলেও আমি মেনে নেব, যা শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে নেব, সব সইতে আজ আমি রাজি আছি।"

অবনী রায়ের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, ক্লিষ্টকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অপরাধই বটে সুরমা, এ অপরাধের শাস্তি আমি যে কি দেব তা ভেবে পাচ্ছিনে। আজ এর বিচার তোলা রইল, এক দিন এর বিচার হবে আর সেদিন ফলও জানতে পারবে।

আস্তে আস্তে তিনি বাহির হইয়া বৈঠকখানার গিয়া বসিলেন।

সাম্‌নেই দেখা গেল ম্যানেজারকে—অবনী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিতেন চৌধুরীর খবর জানো ম্যানেজার—তিনি কেমন আছেন -"

ম্যানেজার মহেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন—তাঁর কি হয়েছে ?"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে অবনী রায় বলিলেন, "আঃ তোমরা কোন খবরই রাখো না ? কাল সন্ধ্যার পর গ্রামে আগুন লেগেছিল জানো—সে আগুন নেভাতে তোমরা কেউ কি গিয়েছিলে ? হাঁ, যাওনি তা আমি জানি। সে আগুন নেভাতে গিয়েছিলেন জিতেন চৌধুরী—ওই ষাট বছরের বুড়ো ; সে আগুনে তিনি পুড়ে গেছেন।"

মহেন্দ্রনাথ কেবল মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

অবনী রায় বলিলেন, "ব্রজ সেখানে গেছে, শুনবামাত্র সে এক মিনিট দেরী করেনি। তার মনুষ্যত্ব আছে ;—সে থাকতে পারলে না —ছুটে চলে গেছে। কিন্তু তার হাতে একটী পয়সাও নেই যে ডাক্তার ডাকাবে, ওষুধ কিনবে বা জিতেন চৌধুরীর মেয়েকে টেলিগ্রাম করবে।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিছু টাকা নিয়ে যাব ?"

অবনী রায় মাথা ত্বলাইলেন—"না। জিতেন চৌধুরী জেনে শুনে আমার টাকা নেবেন না। তিনি বরাবর লোককে দিয়ে এসেছেন, কখনও কারও এক পয়সা নেন্‌নি, সে কথা সবাই যেমন জানে—তুমিও তো তেমনি জানো।"

মহেন্দ্রনাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কিন্তু আদালতে যে অন্য লোকের হাতে দিয়ে আপনি পাঁচশো টাকা—"

অবনী রায় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "চুপ—চুপ কর বলছি ম্যানেজার, সে কথা কেবল তুমি জানো, আর জানে যে দিয়ে এসেছিল সে। যদি এ কথা প্রকাশ পায়—জানো তার ফল কি হবে ?"

মহেন্দ্রনাথ একেবারে নিভিয়া গেলেন, একটি শব্দমাত্র তাঁহার মুখে ফুটিল না।

অবনী রায় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "জিতেন চৌধুরী সে লোক নয় যে কারও একটি পয়সা নেবেন। এ মুল্লুকে এমন একটি লোক নেই যে ওই জিতেন চৌধুরীর কাছ হতে কিছু না

কিছু না পেয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে হোক—সামর্থ্যের দিক দিয়ে হোক, জিতেন চৌধুরী সবারই উপকার করে এসেছেন, কারও এতটুকু অনুপকার তিনি করেন নি। সেই মহৎ প্রবৃত্তি তার মনে আজও আছে, তাই অর্থের দিক দিয়ে না হোক, সামর্থ্যের দিক দিয়ে তিনি পরের উপকার করতে গিয়ে আজ জীবন দিতে বসেছেন। আর তুমি আমি দূর হতে দাঁড়িয়ে আকাশ লাল হতে দেখেছিলেম, কানে ওদের করুণ চীৎকার শুনেছিলেম—তবু এক পাও এগিয়ে যাইনি।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তবু বলি ম্যানেজার, অবনী রায়ই না হয় যায়নি, কিন্তু তোমরা তো যেতে পারতে। অবনী রায়েরও মনে ইচ্ছা হয়েছিল যাওয়ার, কেন যাইনি সে কথা বলবার যো থাকলেও আমি বলতে পারব না। কিন্তু তোমরা,—তুমি, ভশ্চায, গাঙ্গুলী, পরেশ মিত্তির,—তোমরাই বা গেলে না কেন? তোমরা তখন চলে গেলে নিজেদের বাড়ীতে—বিশ্রাম নিতে—আহার করতে, কই একটীবারও ভাবোনি তো—কতলোক গৃহশূন্য হল—কতলোক অনাহারে রইল। তোমরা আমার মন রাখতে আমার বাধ্য ভৃত্যের পরিচয়ই দিলে, মনুষ্যত্বের এতটুকু পরিচয় দিতে পারলে না? আজ বুঝছি—দাসত্ব মানুষকে কতখানি হীন করে, পরের মন রাখতে মানুষ কি রকম ভাবে দয়া, মায়া, সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে।"

মহেন্দ্রনাথ ঘামিয়া উঠিলেন,—

অবনী রায় গড়গড়ার নল ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "সেজন্যে আমি কেবল তোমাকেই দোষ দিচ্ছিনে ম্যানেজার, আমি সকলের কথাই বলছি। মানুষ স্বার্থপর কিনা, নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে এই মানুষই সব কাজ করতে পারে। একদিন যে থাকে দেবতা, সে হয় সয়তান; যার জায়গা ছিল স্বর্গে, গড়িয়ে সে এসে পড়ে নরকের মাঝখানে। এর জন্যে তোমায় আমি দোষ দিচ্ছিনে ম্যানেজার, তুমিও তো সেই মানুষ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত, তাদের বাইরে তো নও।"

সামনের কাগজপত্রগুলি টানিয়া লইয়া তিনি তাহা দেখিতে মনোনিবেশ করিলেন।

*

* *

পারমিতাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া বাড়ীতে আনিবার জন্য ব্রজেশ্বর ষ্টেশনে লোক ও গাড়ী পাঠাইয়াছিল।

ভোলার নাম দিয়া সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিল, পারমিতা যেন টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চলিয়া আসে।—

পারমিতা আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করে নাই।

একজামিন দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিবার জন্য চেষ্টা তাহারও বড় কম ছিল না, কিন্তু যেখানে সে টিউসানী করে তাহারা তাহাকে ছাড়িতেছিল না।

টেলিগ্রাম পাইবামাত্র পারমিতা রওনা হইল।

মন জানিতেছিল কোন একটা বিশেষ রকম দুর্ঘটনা না ঘটিলে তাহাকে টেলিগ্রাম করা হয় নাই। পিতার জন্য তাহার উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না, অনেক কিছু ভাবনাই তাহার মনে উদয় হইতেছিল—কোন কিছুরই সে নিস্পত্তি করিতে পারিতেছিল না।

প্রথমেই মনে পড়িয়া গিয়াছিল অবনী রায় ও ব্রজেশ্বরের কথা।

অবনী রায় লোকটাকে তবু সে এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারে, ব্রজেশ্বরকে সে এতটুকু বিশ্বাস করে না। ব্রজেশ্বরের পরম সুন্দর চেহারা হোক, সে শিক্ষিত হোক, তাহারই আড়ালে তাহার অন্তরের যে পরিচয় পারমিতা পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে কোনমতেই বিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু এও কি হইতে পারে—ব্রজেশ্বর তাহার পিতার অনিষ্ট করিবে? পারমিতা ভাবিয়া পায় না।

ষ্টেশনে যখন সে আসিয়া পৌঁছাইল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দিনের শেষে—আবছা অন্ধকার সামনের মাঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মাঠের ওপারে বুঝি চাঁদ উঠিয়াছে, ওপারের আকাশে তাই লাল

হইয়া উঠিয়াছে, এপারে অন্ধকার গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, অন্ধকারের গাঢ়তা জমিয়া থাকিবে গাছের ঘন পাতার নীচে,—কোনে, গর্ত্তে।

সে নামিতেই রামতনু প্রণাম করিল বলিল, গাড়ী এনেছি দিদিমণি বাবু আপনাকে গাড়ীতে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

পারমিতা বলিল, "গাড়ীর দরকার হবে না রামতনু, আমি হেঁটেই যাব। বেশী পথ তো নয়, এক মাইল দেড় মাইল আমি বেশ হাঁটতে পারব। চাঁদ উঠছে, পথ চিনতে ভুল হবে না। অনর্থক এইটুকু পথ যেতে আবার বার আনা পয়সা লাগাই কেন বল ? ও পয়সাটা থাকলে সত্যিকার কাজে লাগবে এখন।"

সেই পারমিতা, সত্যই সে আজ এত হিসাব করিয়া খরচ করে, বার আনা পয়সা সে অনর্থক খরচ করিতে চায় না।

এই পারমিতাই ছিল অতিরিক্ত ব্যয়শীলা, এক পয়সার জায়গায় সে দশ পয়সা খরচ করিয়া ফেলিত। কোনদিন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই ভবিষ্যতে এমন দিনও আসিতে পারে যেদিন একটা পয়সার মূল্যও সে বুঝিবে। পথে বাহির হইলে দান-ব্যাপারেই তাহার লাগিত পাঁচ সাত টাকা. কেহ কোনদিন তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। বোর্ডিংয়ে কতগুলি দরিদ্র ছাত্রীর খরচ সে নিজে চালাইত, স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহারও এমন দিন আসিবে যেদিন তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে :

অতিরিক্ত ব্যয়শীল পিতার কন্যা সে, পিতৃবংশের দানশীলতা সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল।

সেই পারমিতা, বার আনা পয়সা বাঁচাইবার জন্য এই সন্ধ্যাবেলায় অতখানি পথ হাঁটিয়া চলিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চাঁদের আলো সমস্ত আকাশখানা ছাইয়া ফেলিল, সেই আলোর স্পর্শ আসিল বড় বড় গাছগুলির আগায়, পাতায় পাতায় পড়িয়া চিকমিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

পারমিতা অন্যমনস্কভাবে পথে চলিতেছিল—কোথায় কোন্ গাছের

ঘন পাতার আড়ালে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একটা পাখী অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছিল,—তাহার সুরটা কানে ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহা আসিতেছিল মাত্র।

হঠাৎ এক সময় সে সচকিত হইয়া উঠিল, দৃষ্টি পড়িল মাঠের উপর।

সমস্ত মাঠখানা চাঁদের আলোয় ভাসিয়া গিয়াছে—আলোর সাগরে আলোর ঢেউ চলিয়াছে। সান্ধ্যবাতাসে গাছ নড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, জীবনের স্পন্দন যেন এইখানেই অনুভূত হয়।

মাঠের পানে চাহিয়া চলিতে চলিতে পারমিতা একবার হোঁচট্ খাইল

রামতনু সচকিত হইয়া উঠিল—

গাড়ীখানা অনর্থকই অনেক পিছনে আসিতেছে, দূর হইতে চাকার শব্দ, গাড়োয়ানের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনা যায়।

তবু বেচারা রামতনু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না গাড়ী ভাড়া তাহার লাগিবে না। সে তো এ বংশের তেজ অহঙ্কারের কথা জানে, ইহারা যে আজও শূন্য বংশমর্য্যাদাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, সেই কথা মনে করিয়া সে অনুরোধ করিতে পারিল না। চলিতে চলিতে পারমিতা জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রেনে আসতে শুনলেম, বাবা ভয়ানক পুড়ে গেছেন, বাঁচবেন তো রামতনু ?"

রামতনু সাহস দিল, "বাঁচবেন বই কি দিদিমণি, ডাক্তারবাবু বলেছেন এর চেয়ে অনেক বেশী পোড়া রোগীও তার হাতে ভালো হয়ে উঠেছে"

পারমিতা বলিল, "কোন্ ডাক্তার দেখছেন ?"

রামতনু বলিল, সেই সকালে এখানকার ডাক্তারবাবুই চিকিৎসা করেছিলেন, তারপর কলকাতা হতে আর, এন, মিত্তির না কে একজন বড় ডাক্তার আছেন তাকে আনানো হয়েছে।"

"ডাক্তার আর, এন, মিত্র—"

পারমিতা বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার আর, এন, মিত্র নামজাদা বড় ডাক্তার, তাহাকে এখানে আনিল কে, অত টাকাই বা দিল কে ?

সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁকে পেলে কোথায়, কে তাঁকে আনলে?"

রামতনু উত্তর দিল, "ছোটবাবু—"

"ছোটবাবু—ব্রজবাবু—?"

পারমিতা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

রামতনু বলিল, "তিনিই তো দেখছেন আজ দু'দিন ধরে, আপনাকে তারও তো তিনিই করেছেন দিদিমনি।"

পারমিতা আর একটী কথা না বলিয়া সোজা চলিল—সে তখন কি ভাবিতেছিল কে জানে। রামতনু পিছনে পিছনে বকিতে বকিতে চলিল, "অমন মানুষ আর হয় না। উনি যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মেছেন, নইলে আমাদের বড়বাবুর বংশে অমন ছেলে হয়? তা না হবেই বা কেন,—ওঁর মা কোন বংশের মেয়ে? নবদ্বীপে ওঁর বাপকে সবাই চেনে সবাই জানে। ছোটবাবু ঠিক ওঁর মায়ের ধারায় চলেছেন কি না, দিনকতক বাপের মতে মত দিয়ে বাঁশ দিয়ে মানুষের বুক ডল্‌লে এখন আবার জ্ঞান ফিরেছে।"

পারমিতা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাবু একদিনও আসেন নি?"

রামতনু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, "ছেড়ে দিন দিদিমণি; বড়বাবু কেবল চিনেছেন টাকা, কেবল চিনেছেন বংশ, আর কিছু চেনেন না—জানেন না।"

আকাশে ততক্ষণ সপ্তমীর চাঁদখানা অনেকখানি আগাইরা আসিয়াছে, তাহার শুভ্র আলোকে দু'পাশের ফসলশূন্য মাঠ, সামনের পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আশ-পাশে দুই একটা বড় গাছ পায়ের কাছে অন্ধকার ছায়া ফেলিয়া মাথায় পাতায় জ্যোৎস্না মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে বিরাটকায় দৈত্যের মতই।

বসন্ত নিশীথে জ্যোৎস্না পাইয়া দূরে ও নিকটে পাখী ডাকিতেছিল।

পারমিতা বাড়ী পৌঁছাইল।

জীর্ণ বাড়ীটার উপরে জ্যোৎস্না পড়িয়া আজ তাহাতে আনন্দের বাণ ডাকাইতে পারে নাই, বাড়ীটার বুক হইতে একটা কান্নার ঝরণা যেন উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

কোথায় কে কাঁদে গো ?

বুকের ভিতরটা সেই কান্নার সুরে যেন ফাটিয়া পড়ে, শতধা হইতেচায়।

মা গো মা, এত কান্না তোর বুকে আজও জমিয়া আছে যাহা ঝরণার আকারে উৎসারিত হইয়া আসে ?

উঠানের একধারে বহু পুরাতন গন্ধরাজ ফুলের গাছটা কোন রকমে আজও টিকিয়া আছে। এখানে একদিন কত ফুলের গাছই ছিল; কত ফুল কত প্রভাতে ফুটিয়া কত নিশায় ঝরিয়া গেছে, কত ফুল নিশায় ফুটিয়া প্রভাতে তলায় বিছাইয়া পড়িয়াছে কেই বা আজ তাহার হিসাব করে, কেই বা তাহা জানে ?

সৌখীন জিতেন চৌধুরীর ফুলগাছের সখ তো বড় কম ছিল না। নূরজাহান গোলাপ হইতে আতর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, জিতেন চৌধুরীও অনেক ফুল হইতে অনেক কিছু তৈয়ারী করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

আজ চিহ্নমাত্র নাই এখানে কোনদিন অত ফুলগাছ ছিল।

কেবল দাঁড়াইয়া আছে স্থবির গন্ধরাজ ফুলের গাছটা।

ফুল আজও ফোটে—সংখ্যায় কম এই মাত্র। অল্প ফুটিলেও গন্ধ ছোটে, অনেকখানি জায়গা সে গন্ধে ভরিয়া উঠে।

বাড়ীর পাশে কয়েকটা নারিকেল গাছ মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোৎস্না তাহার সরুপাতার উপর আসিয়া পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে, সেখানে আরম্ভ হইয়াছে আলো অন্ধকারের লুকোচুরি; বাতাসে পাতা কাঁপিতেছিল, উল্টাইয়া পড়িতেছিল, সর্ সর্ শব্দ করিতেছিল।

তাহারই উপরে বসিয়া একটা পেচক গম্ভীর স্বরে কি বলিতেছিল। তাহার গম্ভীর শব্দে পারমিতার তন্দ্রার আবেশ টুটিয়া গেল; অন্তরের জড়তা দূর হইল,—সে পরিপূর্ণ নেত্রে বাড়ীটার পানে তাকাইল।

পিছনে বাগানের খানিকটা চোখে পড়িল—উপরে আলো, তলায় জমাট বাঁধা অন্ধকার, মাঝে মাঝে ঘন পাতার ফাঁক দিয়া এখানে সেখানে এক আধ টুক্‌রা জ্যোৎস্নার টুক্‌রা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ওইখানে ওই বকুল গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছেন পারমিতার মা।

আজ বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পথে প্রথমেই মনে পড়িল মায়ের কথা।

কতকাল আগে মা চলিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর বুক হইতে তাঁহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তবু আজও তাঁহার কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে তিনি পরিতেন চওড়া লালপাড় শাড়ী, সিঁথায় উজ্জ্বল সিন্দুর জ্বলিত, হাতে ছিল দুই গাছি সোণার চুড়ির সঙ্গে লাল দু'টি শাঁখা, সুন্দর স্থলপদ্মের মত পা দু'খানি আলতায় আরও সুন্দর দেখাইত।

মনে পড়ে এই লক্ষ্মী প্রতিমাকে পিতা কি ভালোই না বাসিতেন। পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে সংসারের অনুভূতি তাঁহার ছিল, পত্নীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল বন্ধন যেন কাটিয়া গিয়াছিল।

স্ত্রী ফুল ভালোবাসিতেন বলিয়াই তিনি কত স্থান হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ফুলগাছ আনাইয়া বসাইতেন।

সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসার তাঁহার নিকট হইয়া গেল একেবারে মিথ্যা ;—সেই জন্যই না ঘুচিয়া গেল এত সম্পত্তি। কেহ কিছু বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, বলিতেন, "একটা মাত্র মেয়ে, ওর জন্যে বেশী কিছু না রাখিলেও চলে। বিয়ে যদি করে, সেখানেই ওর সুখে স্বচ্ছন্দে দিন চলে যাবে, দরকার কি বাপের সম্পত্তি ঘাড়ে করে বইবার ? বিয়ে যদি নাও করে, তাতেও কিছু আসবে যাবে না, লেখাপড়া শিখে যেমন করেই হোক সে নিজের ভাত কাপড়ের যোগাড় করে নেবে।

পেচকটা একটা বিকট শব্দ করিয়া পাখার ঝট পট শব্দে নারিকেল গাছের পাতাগুলি কাঁপাইয়া ঠিক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

সেই শব্দে পারমিতা চমকাইয়া উঠিল, পিছনে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রামতনু ঠিকই আছে।

সে উদ্বেগের সহিত প্রশ্ন করিল, "সত্যি বাবা ভালো হবেন তো রামতনু—?"

রামতনু উত্তর দিল, "হবেন বই কি দিদিমণি ? তাঁর জন্যে এই

যে হাজার হাজার লোক ভগবানকে ডাকছে এ কি মিথ্যা হতে পারে? আপনি বাড়ীর মধ্যে চলুন দিদিমণি, বলছি আপনার কোন ভয় নেই।"

শুধু হাসির এতটুকু রেখা পারমিতার মুখের উপর জাগিয়া উঠিল।

সে বলিল, "কেন যে যাচ্ছিনে তা তুমি বুঝতে পারবে না রামতনু, তবু আমায় বাড়ীর মধ্যে যেতেই হবে—বাবাকেও দেখতেই হবে। আচ্ছা এসো।"

সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

*

* *

বিছানার উপর কলাপাতা বিছানো, তাহার উপর পড়িয়া আছেন জিতেন চৌধুরী।

বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে এই কথাটাই মাত্র পারমিতা শুনিতে পাইল, ভরসা সে পাইল না; নির্ব্বাকে কেবল পিতার সর্ব্বাঙ্গের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া গেল।

ব্রজেশ্বর তাহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিল।

শান্তকণ্ঠে বলিল, "এ সময়ে ভুলে যান পারমিতা দেবী, কোন দিন আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতা ছিল। দেখছেন আপনার বাবা কি রকম অবস্থায় পড়ে আছেন, কাজেই আপনাকে এখন সাহায্য না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই জন্যেই বলছি—আমাদের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল তা আপনি ভুলে যান, আমাকে বন্ধু বলে মনে করুন।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পারমিতা বলিল, "বাধ্য হয়ে আপনাকে নিতে হল ব্রজবাবু—বাবা ভালো থাকলে হয় তো—"

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে শত্রুতা আবার জাগাবেন পারমিতা দেবী, আপনার বাবা আবার ভালো হয়ে উঠুন। অন্ততঃ পক্ষে যতদিন উনি এ রকম অবস্থায় থাকেন ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বন্ধুভাবেই ওঁর সেবা করি আসুন। আশা করছি তাতে আপনার কোন আপত্তি হবে না।"

পারমিতা মুখ তুলিয়া তাহার পানে তাকাইল, তাহার চোখ

দুইটী তখন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "কিন্তু উনি যে ভালো হয়ে উঠবেন সে আশা তো আমি একটুও করতে পারছিনে ব্রজবাবু, ওঁর মুখের পানে চেয়ে আমার মনে হয় না উনি আবার চাইবেন, আমার সঙ্গে কথা বলবেন।"

তাহার চোখ উপ্‌ছাইয়া খানিকটা জল ঝরিয়া পড়িল। সে জল ব্রজেশ্বর দেখিতে না পাইলেও তাহার আর্দ্র কণ্ঠস্বর প্রমাণ করিয়া দিল সে কাঁদিতেছে।

মুহূর্ত্তকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সেটা ভবিতব্যের হাতে পারমিতা দেবী, মানুষ কিছুই বলতে পারে না। তবু একটা কথা বলে রাখছি, যদিও ওর কিছু হয়—আপনি বন্ধুহারা হবেন না। কেবল এই কথাটাই মনে রাখবেন—আজ যে হাত আপনার উপকারের জন্যে বিস্তৃত হয়েছে, এ হাত এমনই চিরদিন বিস্তৃত থাকবে।"

পারমিতা পলকহীন নেত্রে খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বোধ হয় অশ্রু গোপনের জন্যই তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সে রাত্রিটা সে পিতার পার্শ্বে বিনিদ্রভাবে বসিয়া কাটাইল। ব্রজেশ্বর বাধা দিয়াছিল কিন্তু সে গাঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল, "আমায় বাধা দেবেন না ব্রজবাবু, আমার কাজ আমায় করতে দিন।

সত্যই এ তাহার কর্ত্তব্য, সেইজন্যই কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেওয়া মহাপাপ।

কিন্তু সে কথা ব্রজেশ্বরের মনে পড়িল না, সে কেবল ভাবিল—আজ যে রাত্রিটা কাটিয়া যাইবে কাল সে রাত্রি আর পাওয়া যাইবে না। আজ যে মুহূর্ত্ত যাইতেছে, এ মুহূর্ত্তটীকে সহস্র কাঁদিলেও মিলিবে না, সেইজন্যই এই মুহূর্ত্ত এবং এই রাত্রিটির সদ্ব্যবহার হোক—পারমিতা নিজের কাজ করিয়া যাক।

উঃ, মানুষ এমন করিয়াও পুড়িয়া যায় ?

পারমিতা দৃপ্ত আলোকে পিতার পানে তাকাইয়াছিল।

দেখিয়া চিনিবার যো নাই এই তাহার পিতা—এই বিখ্যাত জিতেন চৌধুরী। এই যে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, এমনই সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

কিন্তু সেও ভালো।

পারমিতা বিকৃত সেই মুখখানার পানে তাকাইয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবুও বার বার ডাকিতে লাগিল—"নাও ঠাকুর তোমার পূজার এ ফুলটীকে তুমি তুলে নাও, একে আর আগুনে পুড়িয়ো না।"

কতখানি যন্ত্রণায় মানুষ এই সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাতেও এমন ভাবে কাতরোক্তি করে তাহা পারমিতা অন্তর দিয়া বুঝিতেছিল।

কতবার সে পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া চাপা স্বরে ডাকিয়াছে—বাবা—"বাবা, একবার চাও—"

ব্রজেশ্বর নিস্তব্ধে চাহিয়া থাকে—বুঝিতে পারে না কি বলিয়া সে সান্ত্বনা দিবে।

শেষ রাত্রের দিকে পারমিতার চোখ ঘুমে মুদিয়া আসিতেছিল। ব্রজেশ্বর পার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বার বার বলিয়াছে যেন তাহাকে ডাকিয়া দেওয়া হয়।

সামান্য একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র, সেটুকু ছুটিয়া গেল, মনে হইল কে যেন কাঁদিতেছে। তাহার কান্নার স্বর কোন দূরতম স্থান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

পারমিতা শিহরিয়া উঠিল—কান পাতিয়া রহিল।

হাঁ—কে যেন কাঁদিতেছে; তাহার কান্নাভরা কথাগুলো পর্য্যন্ত শুনা যায়—

সে কাহাকে ডাকে, কাহাকে কাছে পাইতে চায়? অন্ধকার রাত্রে সে ভয় পাইয়াছে, কাহাকে সে দু'টী বাহু দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়?

সে চায় আলো, সে আলোর দীপ্তি আছে তাহার প্রিয়তমের দুইটী চোখে, সেই আলোয় তাহার চারিদিককার অন্ধকার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সে তাই ডাকিতেছে—এসো গো, তুমি এসো, আমি এ অন্ধকারে একা যে থাকতে পারছিনে। জীবনে যাকে সাথী করেছিলে, আজ

মরণে তাকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলে গো, তাকে মরণেও সঙ্গিণী কর, তার হাত ধর।

কে কাঁদে—ও কে কাঁদে ?

এ কান্না গুমরিয়া উঠিতেছে ওই বাগানে—ওই বকুলতলায়।

মা গো মা, তুমি তো তোমার সাথীকে ডাকিয়া লইতেছ, তোমার সন্তান একা এখানে কি করিয়া থাকিবে, কে তাহাকে দেখিবে ?

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে লাগিল—

গুম্‌রানি কান্নায় ব্রজেশ্বরের পাতলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল—

"পারমিতা দেবী—পারমিতা—"

পারমিতা মুখ হইতে হাত নামাইল না।

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এ রকম ভাবে কাঁদছেন কেন পারমিতা দেবী ?"

মুখ হইতে হাত নামাইয়া আর্দ্রকণ্ঠে পারমিতা বলিল, "আমরা মিথ্যেই চেষ্টা করছি ব্রজবাবু, বাবাকে বাঁচাতে পারব না। আপনি অনর্থক অজস্র অর্থ ব্যয় করছেন, অনর্থক বড় ডাক্তার এনেছেন, কিছুই হবে না, আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। মা ডাকছেন, বাবা আর এখানে থাকতে পারবেন না ব্রজবাবু—"

ব্রজেশ্বর কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল—"রাত জেগে আপনার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়ে গেছে পারমিতা দেবী, এবার আপনি একটু ঘুমোন, আমি এখানে বসি।"

পারমিতা রাজি হইল না—

বলিল, "আজকের রাত আমি এ বিছানা হতে উঠব না ব্রজবাবু। ডাক্তার ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত দেখতে বলেছেন, ছয়টার পরে আমি উঠব।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কিন্তু আপনার এখন খানিকটা বিশ্রামের আবশ্যক হয়েছে পারমিতা দেবী, আমি আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি।"

পারমিতা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "না, আমি বলছি আমি ক্লান্ত হইনি ব্রজবাবু, আমি বেশ আছি।"

সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পিতার পানে তাকাইয়া রহিল।

*　　*　　*

সুরমার কাছে সংবাদ পৌঁছাইল—জিতেন চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

ক্লান্ত দেহ মন লইয়া ব্রজেশ্বর ফিরিয়া আসিল।

ব্যগ্রকণ্ঠে সুরমা বলিলেন, "তুই চলে এলি ব্রজ, পারু একা সে বাড়ীতে রইল,—থাকতে পারবে কি? তাকে একেবারে সঙ্গে করে আনলিনে কেন?"

ব্রজেশ্বর মাথা দুলাইয়া বলিল, "কারণ সে মোটেই আসবে না মা, সে সেই ভিটেতেই উপস্থিত কিছুদিনের জন্যে থাকবে বললে। নেহাৎ একলাই সে নয় মা, তার সঙ্গে তার ভোলা-দা রয়েছে।"

তারপর একটা হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমাকে আর সেখানে থাকতে দিলে না মা, স্পষ্টই বললে—এ কয়দিন যে জন্যে আমার সাহায্য তাকে নিতে হয়েছিল সে দরকার তার ফুরিয়ে গেছে। তাই বলে সে অকৃতজ্ঞ নয়, চিরদিন সে আমাকে মনে করে রাখবে।"

সুরমা অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন, কতক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "মানুষে মানুষকে মনে করে রাখে বন্ধুরূপেও শুধু নয় ব্রজ, শত্রুরূপেও বটে। আমি বুঝেছি সে তোকে ক্ষমা করতে পারেনি, ওঁকে পারেনি, আর পারবেও না। সে যদি প্রথম মুহূর্ত্তে এখানে থাকত ব্রজ, তোর সাহায্য সে এতটুকুও নিতো না এ কথা আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

ব্রজেশ্বর শ্রান্তভাবে মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "তাই মা—সে কথা ঠিক। এমন দুরবস্থায় পড়েছে, তবু সে সাহায্য চায় না, তবু সে আমাদের ঘৃণা করে।"

সুরমা সংযতকণ্ঠে বলিলেন, "সেইটাই যে স্বাভাবিক ব্রজ। আজ জিতেন চৌধুরী কেন এমন ভাবে জীবন হারালেন, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে চোখ পড়ে তার দারিদ্র্যের 'পরে। তাই না বলছি তোদের সে ক্ষমা করতে পারেনি—কোনদিন পারবেও না। এতদিন তবু তার কাছে দাঁড়াবার মুখ ছিল রে ব্রজ, সে মুখ আর রইলো না।"

ব্রজেশ্বর রাগ করিয়া বলিল, "নাই বা রইলো মা, তার কাছ হতে ক্ষমা পাওয়ার জন্যে আমরা লালায়িত হয়ে নেই। বোলবে তার বাপের সেবা করেছি, সে কতকটা তোমার আদেশে—কতকটা নিজেদের কাজের ফলের গ্লানিতে। সে যদি উপকার মেনে নিত ভালোই, কিন্তু না নিলেও তাকে যে মান্‌তে বাধ্য করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই মা।"

মা উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে তাহার মাথায় কেবল হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

...দাসী আসিয়া সংবাদ দিল বাবু ডাকিতেছেন, তিনি ভিতরে নিজের গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন।

ব্রজেশ্বর উঠিয়া বসিল।

সুরমা বলিলেন, "সমস্ত রাত জেগেছিস ব্রজ; আজও বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো---এখনও খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি। দাহ করে স্নান করে এসেছিস---ভাত হয়ে গেছে; খেয়ে নে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন থাক মা, সন্ধ্যের পরে একবারে খাব এখন। তুমি যাও, বাবা হঠাৎ এখন বাড়ীর মধ্যে এসেছেন কেন,—কেনই বা ডাকছেন শুনে এসো।"

সুরমা উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "কিন্তু সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকলে আবার অসুখ হবে না তোর?"

ব্রজেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল, "ভাতই কেবল খাইনি, দাহ শেষ করে ওখানেই জল খেয়েছি মা, তার জন্যে অসুখ হবে না।"

সুরমা বাহির হইলেন।

অবনী রায় চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, সুরমার পদশব্দ পাইয়া চাহিলেন। তাঁহার শুষ্ক মলিন মুখের পানে তাকাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় বাড়ীর ভিতর এলে যে? মুখখানাও কি রকম দেখাচ্ছে, অসুখ হয়নি তো?"

অবনী রায় মাথা নাড়িলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, না, অসুখ হয়নি—তবে ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা ধরেছে সুরমা। মাথার যন্ত্রণা মাঝে মাঝে হয়, তোমায় কোনদিন জানাইনি, অ্যাস্‌পিরিণ খেয়ে তাই

বেহুঁসের মত পড়ে থাকতেম। আজ অ্যাস্‌পিরিণ খেয়েও নরম পড়লো না, তাই এসে শুয়ে পড়েছি। আমার মাথার কাছে একটু বসো, মাথাটায় হাত বুলিয়ে দাও দেখি।”

সুরমা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিলেন।—

তাঁহার হাতখানা কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে অবনী রায় কেবল একটা শব্দ করিলেন, “আঃ—”

খানিকক্ষণ তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন।

“আচ্ছা সুরমা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্য উত্তর দেবে—?”

সুরমা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, “কি জিজ্ঞাসা করবে বল।”

অবনী রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ প্রায় ত্রিশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে; ত্রিশ বছর তুমি এখানে রয়েছ, এর মধ্যে একটা দিনও তুমি সুখী হয়েছ কি? না, মিছে কথা নয় সুরমা, মন রাখা কথা নয়, সত্য কথা বল।”

সুরমা বিব্রত হইয়া বলিলেন, “এসব কথা তোলবার মানে তো আমি বুঝতে পাচ্ছিনে।”

তাঁহার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবনী রায় বলিলেন, “না বুঝলেও তোমায় বুঝতে হবে সুরমা, তুমি যাই কেন বোঝ, তোমায় উত্তর দিতে হবে। বল সুরমা, আমার কথার উত্তর দাও।”

সুরমা উত্তর দিলেন না।

যে সত্য বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিলেন, তাঁহার নীরবতার মধ্য দিয়া সেই সত্যই ফুটিয়া উঠিল—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অবনী রায় কেবলমাত্র বলিলেন, “বুঝেছি আর বলতে হবে না।”

মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, “সত্যি যা নয় তাকে প্রকাশ করিতে মিথ্যেই সঙ্কুচিতা হয়েছ সুরমা। তুমি না বললেও আমি তো বেশই জানি কোন্ দিন তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছি। তোমায় স্ত্রীরূপে পেয়েছি, কিন্তু ত্রিশ বছরের

মধ্যে একটা দিনও তোমায় স্ত্রীর অধিকার দেইনি। এ কথা স্পষ্ট বলতে সঙ্কুচিতা হওয়ার তো কোন কারণ নেই সুরমা—যা পাওনি তা বলতে লজ্জা সঙ্কোচ আসবে কেন?"

সুরমা আস্তে আস্তে বলিলেন, "কিন্তু আমিও তো তা চাইনি।"

অবনী রায় বলিলেন, "চাওনি অনেক পরে, কিন্তু চেয়েছিলে তারও অনেক আগে। আজ একটা মিথ্যেকে চাপ্‌তে দশটা মিথ্যে আমদানী করো না, সত্যকে ছাই চাপা দিয়ে রাখতে যেয়ো না, সে প্রকাশ হবেই জেনে রেখো। কোন মেয়ে আছে যে চায় না তার সর্ব্বস্ব দিয়ে সেও বিনিময়ে একজনের সবটা পায়,—অন্ততঃপক্ষে কিছুটাও পায়। প্রত্যেক মানুষের মনেই পাওয়ার আশা থাকে সুরমা, মানুষ সম্পূর্ণ ভোগ না করে ত্যাগী হতে পারে না—সত্যকার বিতৃষ্ণা তার জন্মায় না। কিন্তু সেই মানুষই তোমার মত ত্যাগ করতে পারে—তোমার মত সব হতে নির্লিপ্ত হতে পারে তখন, যখন তার উন্মুখ চিত্ত নিতে গিয়ে সব চেয়ে বড় আঘাত পায়। দু'হাত বাড়িয়ে তুমিও ছুটেছিলে—কিন্তু যখন বুকে নিদারুণ আঘাত পেলে তখনই তোমার প্রসারিত হাত নেমে পড়েনি কি, তখনই তুমি ফিরে দাঁড়াওনি কি সুরমা?"

সুরমা মাথা নত করিয়া রহিলেন।

অবনী রায় বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমায় কিছু দেইনি। স্বামীর স্ত্রী হয়েছিলে কিন্তু অধিকার পাওনি, মূলে ছিল তোমার প্রেম আর আমার শক্তি। প্রেম ও শক্তিতে সেদিন যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তাতে জয়লাভ করেছিল শক্তি, প্রেম তার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে মোহ ভেঙ্গে গেছে সুরমা আজ দেখছি শক্তির শক্তি মিলিয়ে গেছে, প্রেমের আধিপত্য আজ বিস্তৃত হতে দেখেছি। আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি আমি পরাজিত, আমি তোমার কাছে নিজেকে ধরা দিতে এসেছি, আমায় তুমি দণ্ড দাও সুরমা, আমি মাথা পেতে সে দণ্ড নেব।"

অবনী রায় সুরমার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

সুরমা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোমার এ পরিবর্ত্তন বুঝেছি। শক্তির মোহে মানুষ অন্ধ হয়, আবার এমনই করে সে শেষটায় প্রেমের

কাছে ধরা দেয়। প্রেম ও শক্তি দু'টিকেই যদি বুকে ধরে চলতে, আজ অনুতাপের আগুনে এমন করে তোমায় পুড়তে হতো না—"

অবনী রায় মুখ তুলিলেন—

"তুমিই বললে না সুরমা—শক্তির মোহে মানুষ অন্ধ হয়? বাঁশী বাজিয়ে রাজ্য জয় করতে কেবল একজন ছাড়া আর কেউ পারেনি, কিন্তু অসি দিয়ে জয় করতে অনেকেই পেরেছে।"

সুরমা বলিলেন, "ভুল বুঝেছ—তুমি অসি নিয়ে যুদ্ধে বার হয়ে কয়জনকে জয় করতে পেরেছ? তোমার ক্ষমতার সামনে সবাই মাথা নুইয়েছে, তোমার আড়ালে তারা মাথা তুলেছে, তোমারই বুকে বসাবে বলে তারা ছোরায় শান দিয়েছে। কিন্তু যে বাঁশী বাজিয়ে জয় করেছিল, সেই মুকুটহীন সম্রাটের মরণের শোভাযাত্রা দেখেছ কি? কেউ কাউকে ডাকেনি, তবু সবাই এসেছে, নিঃশব্দে একবার মৃত দেহ স্পর্শ করেছে, দু'টি ফোঁটা করে চোখের জল উপহার দিয়ে নিঃশব্দেই শবের সঙ্গে শ্মশানে গেছে। এই মুহূর্ত্তে গিয়ে দেখে এসো তুমি, তারা নিজেদের কুটীরে বসে কাঁদছে, তারা আবার তাঁরই মত কোন লোককে পাওয়ার প্রার্থনা করছে।"

অবনী রায় দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইলেন—চাপা সুরে বলিলেন, "আমিও কাল রাত্রে ওখানে গিয়েছিলেম সুরমা—লুকিয়ে—চোরের মত। তখন গভীর রাত্রি, কেউ জেগে নেই—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কি দেখলেম জানো? দেখলেম বিছানায় মুর্চ্ছিত পিতা, সেবা করতে করতে শ্রান্ত পারমিতা ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ব্রজেশ্বর—সে অতৃপ্ত চোখে চেয়ে আছে তারই মুখের দিকে। আমার চোখের সামনে স্বর্গের ছবি ফুটলো—নরককে স্বর্গ করবার কল্পনা জাগলো, আমি সকালের প্রত্যাশায় ফিরে এলেম। ভেবেছিলেম এ রত্ন ভিক্ষা চেয়ে নেব, আমি তাঁর পায়ে ক্ষমা চাইব, জিতেন চৌধুরীর মত লোক নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার আশা মনেই রইল সুরমা, আমি পলকের জন্যে স্বর্গের ছবি কেবলমাত্র দেখলেম, সে স্বপ্নই হয়ে রইল।"

সুরমা পাথরের মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন।

অবনী রায় বলিলেন, "আর কোনদিন পারুর সামনে যাওয়ার মুখ রইলো না,—সে কোনদিন আমায় ক্ষমা করতে পারবে না। আমি যে আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার সকল গ্লানি মুছে ফেলতে চাই এ কথা তাকে আমি কোনদিন বুঝাতে পারব না সুরমা—আর আমি একটী কথাও বলতে পারব না।"

শান্তকণ্ঠে সুরমা বলিলেন, "তুমি পারবে না, ব্রজ পারবে না, কিন্তু আমি পারব। তার সামনে আমিই গিয়ে দাঁড়াতে পারব, আমিই তাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে অবনী রায় বলিলেন, "পারবে ?"

তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া সুরমা বলিলেন, "পারব—আমায় স্ত্রীর অধিকার দাও।"

তাঁহার হাত দু'খানা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে অবনী রায় বলিলেন, "দিলেম সুরমা—আমি নিজেকে তোমার হাতে দিলেম, তুমি যা খুসি কর, যেমন হোক শাস্তি দাও—আমি সব মাথা পেতে নেব। আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক, সে হবে আমার পরম শান্তি—শাস্তি নয়।"

সুরমার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল—অবনী রায় চম্‌কাইয়া তাঁহার পানে তাকাইলেন।—

* * *

পারমিতা ঠিক করিতে পারেনা, সে এখন কি করিবে।

সমস্ত দিনটা সে সমস্ত বাড়ীটায় ঘুরিয়া বেড়ায়, বাগানে যেখানে মায়ের চিতার পার্শ্বে সম্প্রতি পিতার চিতা রচনা হইয়াছিল, সেখানে গিয়া বসিয়া থাকে।—

ভোলা স্থানুবৎ বসিয়া থাকে। পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে একটা মাত্র উত্তর দেয়, কেবল মুখের পানে তাকাইয়া থাকে।

সেও আর বেশী দিন নয়।—

না, কাজ চাই, বিনা কাজে পারমিতা থাকিতে পারিবে না। সে দরখাস্ত করিয়াছে, যেখানেই হোক কাজ পাইলেই চলিয়া যাইবে। এ

বাড়ীতে সে থাকিবে না—থাকিতে পারিবে না। এখানে থাকিয়া স্মৃতির আগুনে পুড়িয়া মরার চেয়ে দূরে থাকা সহস্রগুণে লক্ষগুণে ভালো।—

ব্রজেশ্বর যে তাহার উপকার করিয়াছে তাহা সে ভুলিতে পারিবে না, কিন্তু যে অর্থ সে ব্যয় করিয়াছে এ অর্থ সে শোধ দিবেই।—ঋণ সে রাখিবে না—। পিতা লোককে দান করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভিখারী হইয়াছিলেন, তাঁহারই শেষ অবস্থায় লোকের দানে তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবে না।—

পারমিতা কল্পনা করে তাহার পিতার আত্মা উর্দ্ধলোকে যাইতে পারে নাই, যাইতে পারিবেও না। তাহাকে যেমন করিয়াই হোক অবনী রায়ের টাকা শোধ দিতেই হইবে।

কয়েকটা জায়গায় সে আবেদন করিয়াছিল, ইহারই মধ্যে একজামিনের রেজাল্ট বাহির হওয়াতে দেখা গিয়াছিল সে অনার্সে পাশ হইয়াছে এবং স্কলারশিপও পাইয়াছে।

গৌহাটি হইতে নিয়োগপত্র আসিয়াছিল, বেতন বেশ বেশী, সে হেডমিষ্ট্রেসের পদ পাইয়াছে। সামনের মাসেই তাহাকে কাজে যুক্ত হইতে হইবে, সেইজন্যই খুব শীঘ্র তাহার যাওয়া চাই।

পারমিতা হিসাব করিয়া দেখিল সে যাহা বেতন পাইবে তাহাতে নিজের খরচ চালাইয়া সে কিছুদিনের মধ্যেই দেনা শোধ করিতে পারিবে।

অথচ দেনার পরিমাণ তাহার জানা নাই।

ভোলা-দাকে পাঠানো চলে না—সে একেবারে অমানুষ হইয়া গিয়াছে, কথা বলিলেও সে ভালো বুঝিতে পারে না।

পারমিতা একটী ছেলের হাতে দিয়া একখানা পত্র লিখিয়া ব্রজেশ্বরকে পাঠাইয়া দিল, তাহাতে সে দেনার পরিমাণ জানিতে চাহিল।

সামান্য কয়টা জিনিস গুছাইয়া লইয়া সে ভোলাকে ডাকিয়া বলিল, "তা হলে চল ভোলা-দা গাঁয়ের মায়া কাটিয়ে গৌহাটীতে যাওয়া যাক।"

ভোলা যেন অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে দিদি?"

পারমিতা উত্তর দিল, "গৌহাটীতে একটা স্কুলে কাজ পেয়েছি ভোলা-দা, আমায় কালই রওনা হতে হবে।"

ভোলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু আমার তো যাওয়া হবে না দিদিমণি।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া পারমিতা বলিল, "যাওয়া হবে না মানে, তুমি এখানে থাকবে কোথায় ভোলা-দা? তোমার তো কেউ নেই জানি, আজ একটা অসুখ হলে তোমায় দেখতে কেউ নেই, কোন্ সাহসে তুমি একা এখানে থাকতে চাও শুনি?"

ভোলা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাত বাড়াইয়া আকাশ দেখাইল—

বলিল; "আমার সাহস ওইখানে দিদি, এ ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমার বাবু এ ভিটে ছেড়ে একটী দিনের জন্যে কোথাও যায়নি, সে কথা তুমি আজ ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি দিদি।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল,"আমি এ বাড়ীতে এসেছি এতটুকু বয়সে দিদিমণি, কখনও এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইনি। ওই বাবুকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম তারপর বিয়ে দিলেম — সংসারী করালেম। আবার আমারই সামনে সব গেল,—সম্পত্তি গেল, লক্ষ্মীর মত বউমা গেলেন, অবশেষে সেই বাবু তিনিও কিনা—"

বলিতে বলিতে সে ক্ষুদ্র শিশুর মতই হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

"সেই বাবুও কিনা আমায় ফেলে চলে গেল। তুমি তো অনেক বারই নিয়ে যেতে চেয়েছিলে দিদি, বাবু এই ভিটেয় মরবে—ওইখানে শোবে বলে পণ করেছিল, তাই কোথাও গেল না। তুমি তাকে নিয়ে যেতে পারলে না দিদি, আমায় নিয়ে যেতে চাও, কিন্তু আমি কোথাও যাবনা। আমি এইখানে মরব—এইখানেই শোব।"

পারমিতা মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিতেছিল, একটী কথাও আর তাহার মুখে ফুটিল না।

এমন প্রভুভক্ত ভৃত্যকে সে এ ভিটা ছাড়া করিয়া লইয়া যাইবে কোথায়? এই ভিটায় তাহার পূর্ব্বপুরুষ ঘুমাইয়া আছেন, তাহার মা ঘুমাইয়াছেন, সর্ব্বশেষ তাহার পিতা—তাহার পরম স্নেহময় পিতা—

পারমিতা দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে নিজেই শান্ত হইল—আবার ভোলার নিকটে গেল।

শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তা হলে তুমি এখানেই থাকো ভোলা-দা। তোমাকে দেখা শোনার জন্যে আমি ব্রজবাবুদের বলে দেই—কি বল ?"

বৃদ্ধের মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, সে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদি, কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি একাই বেশ থাকতে পারব, আমি কারও সাহায্য চাইনে। যারা আমার বাবুর মরণের কারণ, আমি তাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে চাইনে—"

পারমিতা শিহরিয়া উঠিল;—

ভোলা বলিতেছিল, "আমি সেসব কথা ভুলিনি দিদি। কুড়ি বছর আগেকার কথা বলি—এই বাড়ী কি জম্‌জমাটই ছিল,—কত আলো, কত লোক; কত গান, কত হাসি, মাত্র কুড়িটা বছর—মনে হয় সেদিনকার কথা। এইতো সেদিন তুমি জন্মালে দিদি,—মেয়ে হয়েছে বলে কত লোকে কত কথাই বললে, কিন্তু বাবুর সে কি আনন্দ ; সকলকে এড়িয়ে বাইরে এসে আমায় বললেন, "মেয়ে কি মানুষ নয় ভোলা ? আমাদের দেশের লোকেরা মেয়েদের কি রকম তাচ্ছিল্য করে দেখেছিস—যেন ওরা বিনা অধিকারেও সব অধিকার করতে এসেছে। এ দেশের মেয়েরা না পায় শিক্ষা, না পারে মানুষ হতে,—আমি সেই জন্যেই আমার মেয়েকে গড়ে দেশের লোককে দেখিয়ে দেব—মেয়েরা মানুষ হতে পারে, তারাও শিক্ষা পেয়ে অনেক কাজ করে।"

পারমিতা দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল, আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আর ওসব কথা তুলো না ভোলা-দা, আমার বুক ফেটে যায়।"

ভোলা বলিল, "কিন্তু আমার মনে যে দিনরাত সেই সব কথাই জাগছে দিদি, আমি যে এক মুহূর্ত্ত সে কথা ভুলতে পারিনে।"

অন্যমনস্ক ভাবে কোনদিকে তাকাইয়া থাকিয়া পারমিতা বলিল, "কিন্তু তুমি তো নিজে রাঁধতে পারবে না ভোলা-দা। আর যে রকম

তোমার শরীর হয়েছে, কোন্ সাহসে তোমায় একা এখানে রেখে যাই—রেখে গিয়েও তো সেখানে শান্তি পাব না।”

শুষ্ক হাসিয়া ভোলা বলিল, “বেশী দিন তো আর বাঁচব না দিদি, একদিন কারও পত্রে শুনতে পাবে তোমার ভোলা-দা আর নেই, বাবুর কাছে সে চলে গেছে।,’

পারমিতা ফিরিয়া আসিল।

সে কি করিবে ভাবিয়া পায়না, ভোলাকে সে কাহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইবে ?

ব্রজেশ্বরের কথাটাই মনে আসিয়া পড়ে।

কিন্তু না, শত্রুর পুত্র, সে শত্রুই হইয়া থাকে, মিত্র হইতে পারে না। আর মিত্র হইলেও ভোলা কখনই তাহার সাহায্য লইবে না, উহার সাহায্য লইবার আগে সে আত্মহত্যা করিবে ?

তুইদিন পরে যাইতে হইবে, এ তু'দিনের মধ্যে পারমিতা উপায় খুঁজিয়া পায় না।

*　　*　　*

সাম্‌নে সব জিনিষপত্র লইয়া পারমিতা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

ব্রজেশ্বর পত্রের উত্তর দেয় নাই, ছেলেটী আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে সে আজই উত্তর দিবে।

কাল এমন সময় পারমিতা থাকিবে ট্রেনে—তু'পাশ দিয়া কত নাম-না-জানা গ্রাম চলিয়া যাইবে, তাহার মনে জাগিয়া থাকিবে এই ছোট গ্রামখানার ছবি।

পিছনে কে আসিয়া দাঁড়াইল—পারমিতা নিঃশব্দ পদশব্দ শুনিতে পাইল না। অনেকক্ষণ পরে চাবির ঝঙ্কারে সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল।

পিছনে যে মেয়েটী দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে সে কোনদিনও চোখে দেখে নাই, তথাপি মনে হইল এ মূর্ত্তি তাহার বড় পরিচিত, ইহার কথাই সে পিতার মুখে, ভোলার মুখে, আর সকলের মুখে শুনিয়াছে।

হাঁ, এই তাঁহার মা।

স্বপ্নে সে ইহাকেই দেখিয়াছে,—ইহাকেই সে পূজা করে। এই

চওড়া লাল পাড় শাড়ী ; এই সিঁথায় সিন্দুর, হাতে লাল শাঁখা,—এই তাহার মা।

নিজের অজ্ঞাতেই সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল,—মেয়েটীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

"আশীর্ব্বাদ করছি মা—মঙ্গল হোক, সুখী হও, শান্তি পাও।"

তিনি পারমিতার হাত ধরিয়া তুলিলেন—পারমিতা তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

মেয়েটী তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কেঁদ না মা, যে আত্মা মুক্ত হয়ে গেছেন তাঁর জন্যে কেঁদে আর নামিয়ে এনো না, তাঁকে সুখী হতে দাও।"

পারমিতা আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমি তো তার জন্যে কাঁদছিনে মা—"

সুরমা বলিলেন, "তবে কেন কাঁদছো মা—?"

পারমিতা দুই হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আবার তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল—"এসেছ যদি, আমায় ছেড়ে যেয়ো না মা—"

সুরমা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তো যাব বলে আসিনি মা, থাকব বলেই এসেছি। তোমায় বুকে তুলে নিলেম মা, আর তো এ বুক হতে নামাব না।"

তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে একটা চুম্বন রেখা আঁকিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি তো জানতে চাইলে না পারু—আমি কে?"

পারমিতা আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "কতকটা বুঝেছি মা। প্রথম দেখেই তোমায় আমার নিজের মা বলে ভেবেছিলেম, তার পরেই ভুল ভেঙ্গে গেছে। তুমি ব্রজবাবুর মা—আমার বাবার—"

তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া সুরমা বলিলেন, "ছি মা, ও কথা বলো না, যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাও। আজ তোমার জায়গায় তোমায় প্রতিষ্ঠিত রাখতেই আমি এসেছি পারমিতা, তোমায় আমি চাকরী করতে দেব না মা।"

পারমিতা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত—মানে?"

সুরমা একখানা কাগজ তাহার সামনে মেলিয়া ধরিলেন—

অবনী রায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পারমিতাকে ফিরাইয়া দিতেছেন এখানি সেই দানপত্র।

পারমিতা মুখ তুলিয়া সুরমার দৃপ্ত মুখখানার পানে তাকাইল—তাঁহার হাতের কাগজখানা সরাইয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, "আমি কিছু চাইনে মা—আমি যেমন আছি তেমনই থাকব, কারও দানে আমি ধনী হতে চাইনে।"

সুরমা তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "পাগল মেয়ে, এ যে তোমারই জিনিস, তোমাকেই তিনি দিচ্ছেন। এই দেখ না এতে লেখা আছে, তিনি অন্যায় করে তোমার জিনিষ নিয়েছিলেন; আবার তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন—"

পারমিতা মুখ তুলিল—

জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জিনিস আমায় সব ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা কোথায় যাবে মা?"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "জায়গার কি অভাব আছে মা? কাশীতে আমরা চলে যাব ঠিক হয়েছে। ব্রজ আবার পাঞ্জাবে ফিরে যাবে। সে কারও অর্থে ধনী হতে চায় না পারু, পুরুষ সে—নিজে উপার্জ্জন করবে প্রতিজ্ঞা করেছে। তোমার জিনিস যে তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারলে এই রইল তার জীবনে পরম সান্ত্বনা। যাও মা, ওখানা তুলে রেখে দাও।

পারমিতা বদ্ধদৃষ্টিতে দানপত্রের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সেখানা টানিয়া লইয়া শতখণ্ডে বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া দিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি চাইনে—মা, আমি চাইনে মা, আমি কিছু চাইনে, আমি যেমন আছি এমনই থাকতে চাই।"

সুরমা বলিলেন, "জিতেন চৌধুরীর মেয়ে নিজের জীবিকার্জ্জন করতে যাবে গৌহাটীতে—আমরা তাই দেখব পারু? তোমার সম্পত্তি নিয়ে আমরা ধনী হয়ে থাকব আর তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার জন্যে অর্থ উপার্জ্জন করবে? পাগ্‌লী, আমি তোমায় কখনো চাকরী করতে যেতে দেব না, আমি তোমায় আমার বাড়ী নিয়ে যাব।"

"তোমার বাড়ী—কি বলছো মা—?"

পারমিতা তাঁহার পানে তাকাইল।

সুরমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, আমার বাড়ী। অধিকার নিয়ে তুমি যাবে পারমিতা, আমি আমার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি, আমার ছেলেও তার বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। আমি তোমায় নিজের সর্ব্বস্ব দান করছি পারমিতা, আমার সব নিয়ে তুমি আমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা কর মা—। আমায় মা বলে ডেকেছ, মায়ের প্রতি তোমার সন্তানের কর্ত্তব্য পালন কর—"

বাহিরের দিকে চাহিয়া তিনি ডাকিলেন—"ব্রজ, একবার এ ঘরে এসো বাবা—"

বাহিরে জুতার শব্দ শুনা গেল, তাহার পরই দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল ব্রজেশ্বর।

সুরমা বলিলেন, "আমার আর তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ব্রজকে ও তোমায় দিচ্ছি মা, আমাদের ঋণ হতে মুক্তি দাও, আমাদের মাপ কর।"

পারমিতা বলিল, "ভুল করেছেন মা, ঋণ আপনারা করেননি, ঋণী আমি। আমি শুনেছি বাবার একবার যখন পাঁচশো টাকা অর্থদণ্ড হয়, তখন আপনার স্বামীই সকলের অজ্ঞাতে একজন অপরিচিত লোকের হাত দিয়ে সেই পাঁচশো টাকা আদালতে জমা দিয়েছিলেন। তারপর তাঁরই অসুখের সময় জলের মত আপনারা অর্থব্যয় করে গেছেন। তাই বলছি মা, ঋণী আপনারা নন, আমিই ঋণী।"

সুরমা বলিলেন, "তবে তুমি নিজেকে সেই ঋণের বদলে আমায় দান কর মা, আমি লক্ষ্মী বরণ করে আমার ঘরে নিয়ে যাই, আমার ঘর স্বর্গ করে তুলি।"

পারমিতা মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সুরমা ব্রজেশ্বরের হাতখানা ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের দুই হাত এক করে দিচ্ছি মা, আমার আশীর্ব্বাদ নাও তোমরা আজ হতে ঋণ মুক্ত।"

পারমিতার হাতখানা ব্রজেশ্বরের হাতের উপর রাখিয়া তিনি আর্দ্র কণ্ঠে ডাকিলেন—"ব্রজ—"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তোমার দান মাথা পেতে নিলেম মা—',

পারমিতার চোখ দিয়া নিঃশব্দে জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

* * *

ভোলা-দা রহিয়া গেল

একটা দুর্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ সে করিয়াছে। মেয়েটার জন্য ভাবনা হইয়াছিল বড় কম নয়। কোথায় সে গৌহাটী সহর কে জানে সেখানে কেই বা দেখিত কেই বা কথা শুনিত। 'হোক অবনী রায়ের পুত্র, তাহার সহিত বিবাহ হইল সেও ভালো।' অবনী রায়ের উপর আর ভোলার রাগ নাই সে শুনিয়াছে অবনী রায়ই সেই পাঁচশত টাকা আদালতে জমা দিয়া তাহার প্রভুকে সে যাত্রা কেবল দারুণ অপমানই নয় জেলের নিদারুণ কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্রজেশ্বর অক্লান্ত সেবা করিয়াছে, জলের মত অর্থ ব্যয়ও করিয়াছে। ভোলা দেখিতেছে শত্রু হইয়াও তাঁহারা পিতাপুত্রে মিত্রের কাজ করিয়াছেন। ভোলা তাঁহাদের ক্ষমা করিয়াছে, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করিয়াছে।

অবনী রায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পুত্র ও পুত্রবধূকে বিবাহের যৌতুক দিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীর কাশী যাওয়া ঠিক হইয়াছে।

যে সব প্রজারা জেলে গিয়াছিল, তাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে, সেদিনে বৌভাতের নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলেই নব দম্পতির দীর্ঘ জীবন ও সুখশান্তি কামনা করিয়া গিয়াছে।

অবনী রায় ও সুরমার কাশী যাত্রার কথা শুনিয়া পারমিতা সজল চোখে বলিল, "আমরা কি অপরাধ করেছি যে আপনারা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বাবা?"

অবনী রায় হাসিলেন, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এ তোমাদের অপরাধ নয় মা কল্যানী, এ আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করতে তীর্থস্থানে চলেছি।"

পারমিতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যদি আপনি পাপ মনে করে থাকেন, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক আগেই তো হয়ে গেছে বাবা।"

অবনী রায় বলিলেন, "হয় তো হয়েছে, সে কথা স্বীকার করছি, না হলে তোমার মত লক্ষ্মীকে আমার ঘরে স্থাপন করতে পারতাম না। ঠিক প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছিনে মা, আমি এখন যাচ্ছি সংসারের মায়া কাটিয়ে কোন তীর্থে গিয়ে ভগবানের নাম করতে, সংসার আর ভালো লাগছে না। তোমার শ্বাশুড়ীকেও বড় কম কষ্ট দেইনি মা— সতী সাধ্বী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে গেছেন। সে সব দিনের কথা ভুলতে পারিনি মা, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতেই হবে যে। তাই বলছি—বাধা দিয়ো না আমায়, তীর্থে যেতে দাও, তোমরা বরং মাঝে মাঝে একবার দেখা করে এসো।"

বিদায় মুহূর্ত্তে মাকে প্রণাম করিতে গিয়া ব্রজেশ্বর ও পারমিতা কাঁদিয়া ভাসাইল।

দুইজনকে দুই হাতে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সজল চোখে সুরমা বলিলেন, কেঁদো না ব্রজ, কেঁদো না বউমা। আবার আমাদের দেখা হবে। যে **পরশমণির** ছোঁয়া আমাদের সোনা করে দিয়েছে, তার আকর্ষণে হয় তো আমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে যাই শান্তিতে যেন জীবন কাটে—আমার এই পরশমণির ছোঁয়ায় যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। বউমা—আমার পেছনে যারা পড়ে রইলো, তাদের দেখো—তাদের যাতে ভালো হয় তা কোরো। দুঃস্থ যেন তোমার দরজা হতে ফিরে না যায়, তোমার দরজা যেন তাদের জন্যে সর্বদা খোলা থাকে।"

পারমিতা মাথা পাতিয়া আশীবাদ লইল, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কতদিন কাশীতে থাকবে মা, আমি বাবা আর তোমাকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসব, নইলে আমার পরশমণি নামই যে মিথ্যে হয়ে যাবে মা।"

বিদায় লইলেন সুরমা ও অবনী রায়। ব্রজেশ্বর ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় পারমিতা দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল। সুরমা পালকীর দরজা ফাঁক করিয়া তাকাইয়াছিলেন।

তাহার পর অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিলেন।

॥ সমাপ্ত ॥